প্রথম অধ্যায়

ভারতের ফৌজদারি ন্যায়বিচার: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা
(Laws Relating to Criminal Jurisdiction in India: A Brief Outline)

প্রসিদ্ধ আইনবিদ Fali S. Nariman তাঁর *India's Legal System* গ্রন্থে লিখেছেন, "The legal system in India is inextricably linked with the English language: both were originally imported from abroad ... Originally an English transplant with Anglo-Saxon roots, the legal system in India has grown over the years, nourished in Indian soil. What was intended to be an English oak has turned into a large, sprawling Indian banyan tree, whose serial roots has descended to the ground to become new trunks." নরিম্যান বলতে চেয়েছেন যে ভারতের আইন ব্যবস্থার সঙ্গে ইংরাজি ভাষার গভীর যোগ রয়েছে—উভয়ই বিদেশ থেকে আমদানি করা। ভাবা হয়েছিল যে এটা একটা ইংরেজ ওক বৃক্ষে পরিণত হবে কিন্তু বাস্তবে এটা একটা বিরাট ভারতীয় বট বৃক্ষে পরিণত হয়েছে এবং এই বট গাছের জটাগুলি এক একটি কাণ্ডে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ ব্রিটেন থেকে আমদানি করা হলেও এর অ্যাংলো-স্যাক্সন শিকড় এখন ভারতীয় মাটিতে মিশে গিয়ে নতুনভাবে গড়ে উঠেছে।

আবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সর্বাধিক সময়কালীন কর্মাসীন বিচারপতি (longest serving member of the U.S. Supreme Court, 1939-75) বিচারপতি উইলিয়াম ও. ডগলাস (Justice William O. Douglas) ভারতে এসে এখানকার আইনপ্রণেতা ও আইনজীবীদের উদ্দেশ্য করে একবার বলেছিলেন, "As nightfall does not come all at once, neither does oppression. In both instances, there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such twilight that we all must be most aware of change in the air—however slight—lest we become unwitting victims of the darkness." (The Douglas Letters, 1987)। বিচারপতি ডগলাস বলতে চেয়েছেন রাত্রিবেলা আর শোষণ হঠাৎ করে নেমে আসে না; মাঝে একটা গোধূলি লগ্ন নেমে আসে; সেই সময়

আইনপ্রণেতাদের বুঝে নিতে হবে আইনের কী ধরনের পরিবর্তন আনা দরকার; না হলে হঠাৎ করে অন্ধকার আমাদের গ্রাস করবে।

এই দুই প্রসিদ্ধ আইনবিশারদের মন্তব্যের আলোকে আমরা ভারতের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা ও দণ্ডবিধি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

এখানে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী: ১। ফৌজদারি এলাকা সংক্রান্ত দণ্ডবিধি; ২। পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা FIR করার পদ্ধতি; ৩। গ্রেপ্তার, জামিন, পুলিশি অনুসন্ধান (search) ও বাজেয়াপ্তকরণ (seizure) সংক্রান্ত বিধি; ৪। ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী সাক্ষ্য দেবার কিছু পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা।

১। ফৌজদারি এলাকা সংক্রান্ত দণ্ডবিধি (Laws Relating to Criminal Jurisdiction)

ব্রিটেনের প্রখ্যাত আইনবিশারদ উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন (William Blackstone)— যিনি Father of English Common Law রূপে পরিচিত— একদা বলেছিলেন যে একজন নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার থেকে কিছু অপরাধী শাস্তি না পাওয়াও ভালো ("better that guilty persons go unpunished than that one innocent person suffer")। ব্রিটেনের মতো ভারতেও এটি ফৌজদারি দণ্ডপ্রথার মূল ভিত্তি। নরিম্যানের ভাষায়, "Criminal jurisprudence in India is a British legacy."

ভারতের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার তিনটি অংশ আছে—

- আইন কার্যকর করার এজেন্সি বা পুলিশ
- কোর্ট এবং বাদী ও বিবাদী পক্ষের আইনজীবী এবং
- সংশোধনাগার ও অন্যান্য এজেন্সি

দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি ও আইন কমিশনের (Law Commission) সদস্য এস. মুরলিধর তাঁর *Law, Poverty and Legal Aid – Access to Criminal Justice* (2004) বইতে বলেছেন ১৯৯৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ৫০,০০,০০০ অপরাধ সংগঠিত হয়েছে— এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ IPC বা ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ও বাকিগুলি অন্যান্য আইন অনুযায়ী। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পুলিশের— তাদের সংখ্যা ১২,০০,০০০-১৩,০০,০০০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ; অপরাধের প্রাথমিক অনুসন্ধান তারাই করেন; তাই কাজের চাপ অনেক বেশি। ২০১৬ সালে ২,৭১,৭৬,০২৯-টি মামলা আদালতে অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল কারণ বিচারপতির সংখ্যা অপ্রতুল— মাত্র ২০,৫৫৮-টি অনুমোদিত পদ। ২,০০,০০০ undertrail বা বিচারাধীন ব্যক্তি জেলে দিন কাটাচ্ছেন বিনা বিচারে। সংশোধনাগার ও হাজতের অবস্থা করুণ। প্রায় ৬৫,০০,০০০ ব্যক্তি প্রত্যেক বছর গ্রেপ্তার হন; এর মধ্যে ১৩০০ জন হাজতে নির্যাতনের শিকার হন (Nariman, *India's Legal System* থেকে তথ্য সংগৃহীত)।

বিচারপতি V.S. Malimath-এর সভাপতিত্বে ভারত সরকার ২০০০ সালে একটি Committee on Reforms of the Criminal Justice System নিয়োগ করে। কমিটি ২০০৩ সালে রিপোর্ট পেশ করে এবং ২০০৬ সালে Criminal Law Amendment Act রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লাভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অপরাধের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী।

নরিম্যান তাঁর *Indian Legal System* বইতে কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ করেছেন:

ক) অপরাধের জন্য ভারতে প্রচলিত শাস্তিগুলি অচল (out of date)। IPC (1860)-এর Section 53 অনুযায়ী পাঁচ ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে:

- মৃত্যুদণ্ড— যা সুপ্রিম কোর্টের ভাষায় বিরল থেকে বিরলতম (rarest of the rare case) ক্ষেত্রে দেওয়া যায়;
- আজীবন কারাদণ্ড;
- সাধারণ ও সশ্রম কারাদণ্ড;
- সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা;
- ফাইন (fine) বা জরিমানা।

সংশোধনী আইনে আরও তিন ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে:

- externment
- অপরাধের যিনি শিকার তাঁকে ক্ষতিপূরণ এবং
- জনসমক্ষে অপমান (public censure)।

বলাবাহুল্য এগুলি কার্যকর হয়নি।

খ) অপরাধের শিকারকে ক্ষতিপূরণ দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। আইন কমিশন এটির সুপারিশ করা সত্ত্বেও।

গ) বাধ্যতামূলক কারাদণ্ড সবক্ষেত্রে সমাধান নয়; এর ফল বিপরীত হতে পারে।

ঘ) অভিযুক্তের নীরবতাকে বেশি গুরুত্ব না দেওয়া। অভিযুক্তের সাক্ষ্য বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার।

ঙ) অপরাধ দমনের আদর্শ পন্থার অভাব— "we insist on search for *proof* rather than search for *truth*." (Nariman)

চ) বিচারপতিদের ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা।

ছ) যুক্তিসংগত মানদণ্ড বা প্রমাণ সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার অসুবিধা।

জ) Trial judge-এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ঝ) কোর্টগুলি court of evidence হিসেবে কাজ করে; court of justice নয়।

ঞ) বিত্তবানেরা বিচারব্যবস্থাকে নানাভাবে ছলচাতুরি করে নিজেদের সপক্ষে রায় দিতে বাধ্য করতে পারেন।

নরিম্যান অস্ট্রেলিয়ার হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Owen Dixon-এর একটি বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বিচারের কাজ কত চমকপ্রদ সেই ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে বিচারপতি ডিকসন বলেছিলেন, যখন আমি আপিল কোর্টে বিচার করতে বসি কোনো তথ্য জানা থাকে না— এক-তৃতীয়াংশ তথ্য যে কোনো সাধারণ মানুষ ভুলে যান; এক-তৃতীয়াংশ আইনজীবীদের উপেক্ষার ফলে হারিয়ে যায়। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ অচল, পুরাতন সাবেকি evidence law বা প্রমাণ আইনের আড়ালে লুকিয়ে যায়। তাঁর নিজের ভাষায়, "I have nothing to do with justice. I sit on a court of appeal where none of the facts are known—one-third of the facts are excluded by normal frailty of memory, one-third by negligence of the legal profession, and the remaining one-third by the archaic laws of evidence." নরিম্যানের মতে তাই সত্যিকারের ন্যায় প্রতিষ্ঠা একটি কঠিন কাজ।

নরিম্যান মন্তব্য করেছেন, "The main problem in our criminal justice system is that there is little room for a proactive trial judge to make all manner of procedural orders for ascertaining the truth." আইনের বইতে নানা পদ্ধতির উল্লেখ করলেও একজন trial judge— তিনি যত সক্রিয় বা তৎপরই হোন না কেন— নানাভাবে বিধি-নিয়মের বেড়াজালে তিনি আবদ্ধ থাকেন। ১৯৭৩ সালের Code of Criminal Procedure-এর Section 311 অনুযায়ী একজন trial judge বা প্রাথমিক বিচারক তদন্তের যে কোনো স্তরে যাকে হোক সাক্ষী হিসাবে তলব করতে পারেন, একজন সাক্ষীকে পুনরায় জবানবন্দি দিতে বলতে পারেন যদি তাঁর প্রমাণ বা সাক্ষ্য ওই মামলাটির জন্য অত্যাবশ্যক হয় ("if his evidence appears to be essential for a just decision of the case.")। কিন্তু নানা কারণে নরিম্যানের মতে, "this provision remains a dead letter"। সাধারণত trial judge সরকারি উকিল বা prosecution-এর নির্ভর করেন এবং সরকারি prosecution-এর দক্ষতার অভাবে অভিযুক্তকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত Committee on Reforms of Criminal Justice System (2000)-এর সভাপতি বিচারপতি ভি.এস. মালিমথ (Justice V.S. Malimath) বলেছিলেন, "The judge, in his anxiety to maintain his position of neutrality, never takes any initiative to discover the truth ... he plays a passive role. The system is heavily loaded in favour of the accused, and is insensitive to the victims' plight and rights." বিচারপতি অতি-তৎপরতা দেখালে তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাই তিনি খানিকটা নিষ্ক্রিয় থাকেন ব্যবস্থার চাপে পড়ে; এবং আখেরে লাভ হয় অভিযুক্ত ব্যক্তির বা আসামির। নরিম্যান মন্তব্য করেছেন, "In this country of ours, the judiciary is the salt of the earth ... as the Bible warns us: if the salt ever

loses its savour, then wherenith shall it be salted?" (*Indian Legal System*, p. 147)। আমরা আর একজন প্রধান সংবিধান বিশারদ, রাম জেঠমালানির বক্তব্য দিয়ে আমাদের এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করব। শ্রী জেঠমালানি বলেছেন, "Judges are the fulcrum of the constitution ... The function of the judge is to see that law is enforced and the law-breaker punished. Today ... the soul of Law is enforcement ... Law enforcement is suffering. It needs fresh air to fuel the combustion hidden in its heart." (Ram Jethmalani: *Maverick Unchanged, Unrepentant*, 2014)।

ভারতের ফৌজদারি ন্যায়ব্যবস্থায় (Criminal Justice System) একগুচ্ছ আইন লিপিবদ্ধ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- Indian Penal Code, 1860
- Dowry Prohibition Act, 1961
- Protection of Civil Rights Acts, 1955
- Prevention of Food Adulteration Act, 1954
- Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
- Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994
- Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 ইত্যাদি।

এছাড়া Indian Evidence Act-এ লেখা আছে প্রমাণ কীভাবে পেশ করতে হয়। আর Code of Criminal Procedure (CrPC) 1973-তে দেওয়া আছে অপরাধ তদন্ত, বিচার ইত্যাদি পদ্ধতিসমূহ। এইসব আইনগুলি নিয়ে ভারতের Cirminal Justice System । পুলিশ প্রশাসন আবার নিয়ন্ত্রিত হয় Police Act 1861 দ্বারা। CrPC জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের সর্বত্র প্রযোজ্য। সংবিধানের 370 ধারায় জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

ফৌজদারি মামলার বিচারে Public Prosecutor বা সরকারি উকিল একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ভারতের আইন কমিশন (Law Commission)-এর ভাষায়, "The purpose of a criminal trial being to determine the guilt or innocence of the accused person, the duty of the Public Prosecutor is not to represent any particular party, but the state ... the impartiality of his conduct is as vital as the impartiality of the court itself." (*Oxford Handbook of Human Rights and Criminal Justice in India*, 3rd ed.)। অর্থাৎ ফৌজদারি বিচারে সরকারি উকিল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন; কোনো পক্ষের নয়। কোর্টের মতো তিনিও পক্ষপাতশূন্য হবেন। সুপ্রিম কোর্ট ভারতের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। রাজ্যস্তরে বিচার ব্যবস্থার চিত্রটি নিম্নরূপ:

State Criminal Court System

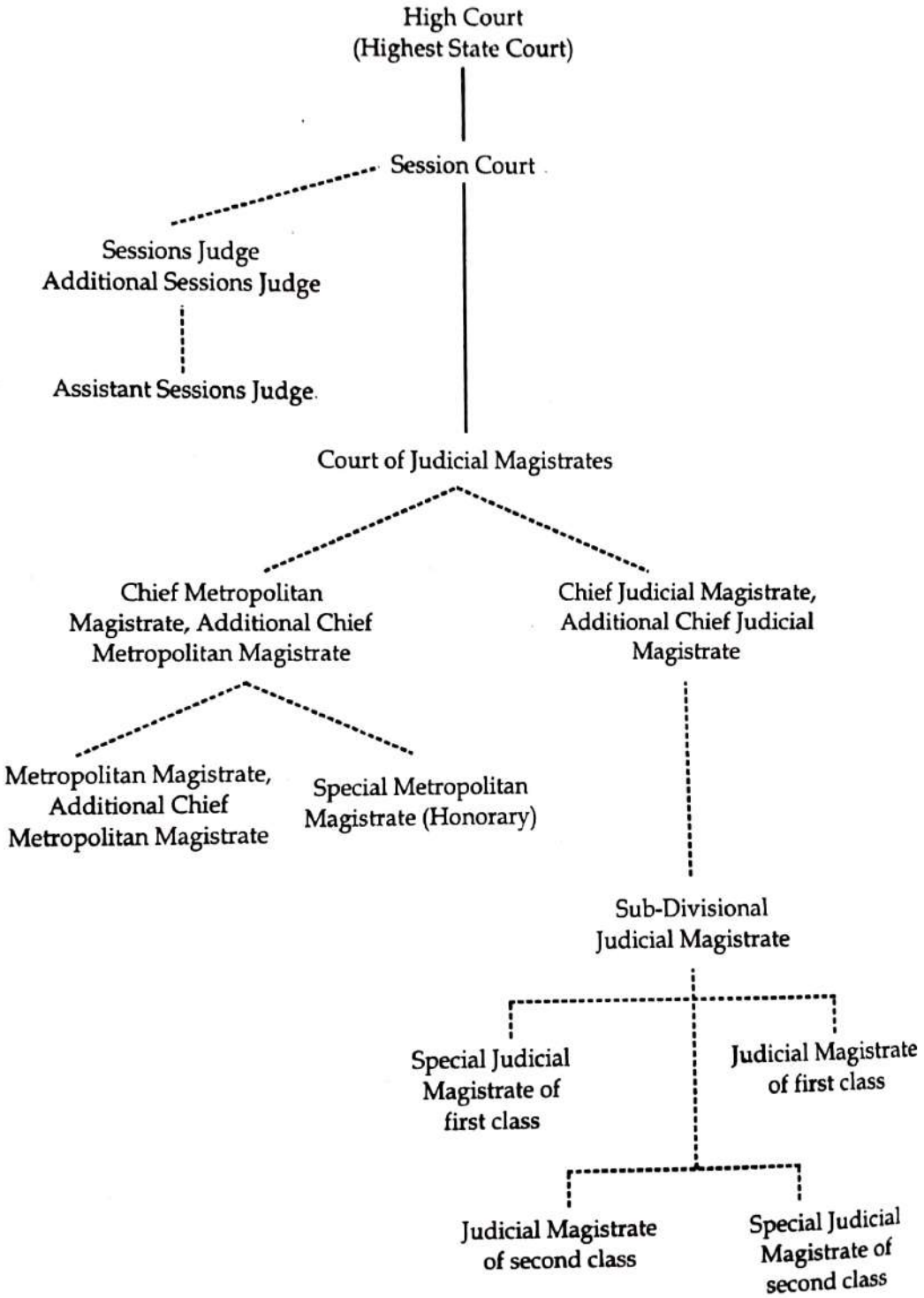

গ্রন্থসূত্র: *Oxford Handbook of Human Rights and Criminal Justice*

1. পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা FIR করার পদ্ধতি

CrPC-তে FIR বা First Information Report শব্দবন্ধটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। কিন্তু Section 154-তে এর উল্লেখ আছে। *Oxford Handbook of Human Rights and Criminal Justice* অনুযায়ী "A First Information Report (FIR) is a formal statement given to and recorded by the police regarding a cognizable offence" অর্থাৎ FIR হল পুলিশের কাছে প্রাথমিক সূচনা যা একটি বিচার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ সম্পর্কে পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে লিখে নেয়। "It is the earliest report made to the police and is intended to prompt the police into taking action." এটি পুলিশের কাছে প্রদত্ত প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন এবং পুলিশকে তদন্ত করতে প্রেরণা জোগায়। FIR কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধন করে:

১। এটি পুলিশি তদন্তের সূচনা করে এবং অপরাধীর গ্রেপ্তার ও বিচারের সূত্রপাত ঘটাতে পারে

২। এটি ফৌজদারি অপরাধ সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্ট; পরে হয়তো স্মৃতিবিভ্রম ঘটতে পারে; তাই প্রমাণ আইনে (Evidence Act)-এর গুরুত্ব যথেষ্ট।

• কী করে FIR দাখিল করতে হয় (How to lodge an FIR)

একজন অপরাধের শিকার (victim) বা সাক্ষী (witness) পুরো ঘটনাটি লিখে সই করে পুলিশের কাছে জমা দেবেন (নীচে FIR-এর একটি বয়ান দেওয়া হল)। তথ্যটি দিতে হবে থানার officer-in-charge বা তিনি না থাকলে তাঁর পরেই যে উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা আছেন তাঁর কাছে। অভিযোগকারী যদি লিখে জমা না দেন বা লিখতে অসমর্থ হন তাহলে পুলিশ তা লিখে নেবেন ও অভিযোগকারীকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়ে সই করিয়ে নেবেন। FIR-এ মিথ্যা তথ্য দেওয়া IPC-এর Section 203 অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। টেলিফোনের মাধ্যমেও FIR দাখিল করা যেতে পারে যদি পুলিশ অভিযোগকারীর পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হন। তবে টেলিফোনের থেকে নিজে থানায় গিয়ে অভিযোগ করাটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কোনো কোনো রাজ্যে online FIR-এর ব্যবস্থা আছে। (পরে এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।) *Oxford Handbook of Human Rights and Criminal Justice* অনুযায়ী FIR করার দরকারি তথ্যগুলি নিম্নরূপ:

১। • অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (The name and address of the informant/victim)

• অভিযুক্তের (যদি জানা থাকে) নাম ও ঠিকানা (The name and address of the accused, if known)

- অপরাধ বা ঘটনা ঘটার তারিখ, স্থান ও সময় (The date, place and time of the offence)
- অপরাধের সম্পূর্ণ বিবরণ (The details of the offence)
- সাক্ষীদের পরিচিতি (The identity of any witnesses)
- যা ঘটেছে তার আনুপূর্বিক ও সঠিক বিবরণ (An actual description of what happened) এবং
- FIR দাখিল করতে যদি দেরি হয় তার কারণ দেখানো (The reasons for any delay in reporting the offence)

২। থানার বড়োবাবু বা Officer-in-charge-এর কাছে FIR করতে হবে।

৩। FIR লিখিতভাবে করতে হবে বা পুলিশ লিখে নেবেন।

৪। অভিযোগকারীকে সই করতে হবে, বা আঙুলের ছাপ দিতে হবে। সই করতে অস্বীকার করা IPC-এর Section 180 অনুযায়ী একটি ফৌজদারি অপরাধ।

৫। পুলিশ অভিযোগকারীকে বিনা পয়সায় বিধিবদ্ধভাবে FIR-এর একটি কপি দিতে বাধ্য। যদি O.C. না দেন তাহলে S.P. বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করা যেতে পারে।

৬। FIR-টি থানার সরকারি ডায়েরি (official diary)-তে নথিবদ্ধ করতে হবে।

নিম্নলিখিতগুলি FIR বলে বিবেচিত হবে না:

- তদন্ত শুরু হওয়ার পর কোনো বক্তব্য
- অস্বচ্ছ বা অনির্দিষ্ট তথ্য
- Cryptic message বা সাংকেতিক ভাষায় লেখা কোনো তথ্য
- তারিখ না দেওয়া, সই না করা, অজ্ঞাত পরিচয় অভিযোগকারীর চিঠি।

→ সাধারণত অপরাধ ঘটনার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব FIR করা উচিত তবে কোর্ট অবস্থা বিবেচনা করে দেরিতে FIR করার অনুমতি দিতে পারে যেমন *কৃষ্ণা পিল্লাই* (১৯৮১) মামলার অভিযোগকারীরা এতটাই শোকাহত ছিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট ১২ ঘণ্টা পরেও FIR করার অনুমতি দেয়।

→ পুলিশ FIR না করতে চাইলে S.P. বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জানানো যেতে পারে।

→ মিথ্যা FIR একটি দণ্ডনীয় অপরাধ (IPC Section 203)।

→ Online FIR— বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশ প্রশাসন on-line FIR দাখিল করা শুরু করেছে। ইন্টারনেট প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী হরিয়ানা উত্তর ভারতের পাঁচটি সর্বাপেক্ষা অপরাধপ্রবণ রাজ্যের মধ্যে অন্যতম। হরিয়ানায় on-line FIR করার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

প্রথম পর্যায়: যে কোনো e-Disha কেন্দ্র বা cyber cafe-তে যেতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়: বাড়ি থেকেও ইন্টারনেট পরিষেবার মাধ্যমে করতে হলে 'Har Samay' শব্দগুলি enter করতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়: 'Welcome to Haryana Police' লিঙ্কটি খুলতে হবে। সরকারি ওয়েবসাইট: haryanapoliceonline.gov.in – এই সাইটে যেতে হবে।

চতুর্থ পর্যায়: এছাড়াও অভিযোগকারীরা harsamay.gov.in/ – এই সাইটে যেতে পারেন।

পঞ্চম পর্যায়: scroll করে নীচের দিকে 'Citizen login' home page-এ ক্লিক করতে হবে।

ষষ্ঠ পর্যায়: নিজের ব্যক্তিগত তথ্য যথা নাম, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি দিয়ে বিধিবদ্ধ বা রেজিস্টার করতে হবে।

সপ্তম পর্যায়: নিজের account থেকে প্রবেশ করে online FIR প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। হরিয়ানা পুলিশ জনসাধারণকে website ও fact ভালো করে পড়ে নিতে নির্দেশ দেয়।

অষ্টম পর্যায়: 'Complaint' বা 'Citizen Services', item-টি sellect করতে হবে।

নবম পর্যায়: নিজের অভিযোগ ও ব্যক্তিগত বক্তব্য 'grievance form'-এ পূরণ করতে হবে।

দশম পর্যায়: সমস্ত তথ্য পুনরায় দেখে নিয়ে online form-টি submit করতে হবে।

একাদশ পর্যায়: এখন অভিযোগকারীর e-mail-এ একটি sms message আসবে।

দ্বাদশ পর্যায়: সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তারা বিষয়টি জানবেন।

ত্রয়োদশ পর্যায়: Status Search-এ গিয়ে অভিযোগকারী তার অভিযোগের অবস্থান কী তা জানতে পারে।

চতুর্দশ পর্যায়: নিয়মিত Citizen Portal check করতে হবে।

পঞ্চদশ পর্যায়: তিনটি জিনিস থাকা অত্যন্ত জরুরি— একটি চলমান ই-মেল, মোবাইল ফোন (SMS সুবিধাসহ) এবং এগুলি যেন বৈধ হয়।

ষষ্ঠদশ পর্যায়: Chrome, Fireforx, IE— এই জাতীয় browser ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

সপ্তদশ পর্যায়: আধার কার্ড বাধ্যতামূলক পরিচয়পত্র।

অষ্টাদশ পর্যায়: অন্য পরিচয়পত্রের মধ্যে রয়েছে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার ID কার্ড, Arms license, রেশন কার্ড, আয়কর PAN Card।

ঊনবিংশ পর্যায়: কোন এলাকা, যথা colony/locality/area/গ্রাম/শহর/নগর/ব্লক/মণ্ডল/তহশিল-এর বিবরণ চাই।

Sample of an FIR

Manik Dey
A-12/3, Golf Green,
Kolkata- 700 029

22 May 2019
Officer-in-Charge
Tollygunge Police Station
Kolkata

Dear Sir,

This is to request you to lodge a First Information Report (FIR) against Mr. Anil Roy. He lives at A-12/2, Golf Green, Kolkata- 700 029. His phone number is 1234 5678.

Yesterday evening I was at home dining with my wife Arpita. At 8.20 pm the doorbell rang and I opened the door. Mr. Anil Roy was standing at our door with his wife Mrs. Kamala Roy and another man whom we do not know. Mr. Roy is our landlord.

Mr. Roy told me that we owed him rupees ten thousand for the electricity bill and minor repairs to be done in our apartment, specially a broken tap, broken toilet seat and a broken geyser. I explained that as he was the landlord he was obliged to pay for minor repairs to the apartment, and that I would not be paying the electricity bill. I had been suspecting since few months that Mr. Roy had illegally rigged the electricity meter so that I also have to pay for the electricity for his apartment.

Mr. Roy grew very angry, and, after a heated conversation, I told him that there was no point in arguing about it because I was not going to pay him any money. I tried to close the door, but Mr Roy punched me in the head. Mrs Roy and the other man then forcefully entered our apartment, and pushed my wife to the floor. Mrs Roy started kicking my wife on the stomach. I tried to intervene, but Mr Roy and the other man pushed me against the wall, punched me on the stomach and slapped me. During the attack, Mr and Mrs Roy had called the other man, Dulal. That man was in his mid-twenties, was wearing a hat, and had a short vertical scar on his left cheek.

Finally, before leaving, Mr. Roy said "you better pay up, or we will be back." My wife sustained a cut on her head which was

bleeding, and I suffered a black eye, a bloody nose, and sore ribs. We immediately went to Modern Medical Centre where, both my wife and I were admitted. The consultant, Dr. Sudip Gupta informed that I had three broken ribs, and that my wife was in shock and was suffering internal bleeding. I was released from the hospital the next day (today). However my wife must stay in the hospital until the end of the week.
I would be grateful if an FIR is filed for criminal trespass, and serious assault.
Mr and Mrs Roy and their friend must be arrested immediately.

Yours sincerely,
[signature here]
Manik Dey

গ্রন্থসূত্র: *Oxford Handbook of Human Rights and Criminal Justice*

2. গ্রেপ্তার, জামিন, পুলিশি অনুসন্ধান ও বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত বিধি (Laws Relating to Arrests, Bail, Search and Seizure)

• গ্রেপ্তার (ARREST)

"An arrest is the deprivation of an individual's personal liberty by a legal authority. It may be used to secure the attendance of the accused at trial or to stop the commission of an offence." (*Oxford Handbook of Human Rights and Criminal Justice*)।

একটি বৈধ কর্তৃত্ব দ্বারা একজন ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করাকে গ্রেপ্তার বলে। গ্রেপ্তার দুটি কারণে করা যেতে পারে: (১) অভিযুক্তকে আদালতে উপস্থিত করানোর উদ্দেশ্যে; (২) কোনো অপরাধ যাতে না ঘটে তার জন্য। CrPC-এর Section 46(1) অনুযায়ী, "... in making an arrest, the police officer shall 'touch or confine the body of the person to be arrested' unless the person being arrested submits to the police officer's custody by word or action." অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে পুলিশ অফিসার তাঁকে শারীরিকভাবে স্পর্শ করতে ও আটক করতে পারেন। গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা (warrant) লাগে; তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে warrant ছাড়াও গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। নীচে warrent-এর একটি নমুনা দেওয়া হল:

Arrest Warrant-এর নমুনা

Sample Warrant of Arrest
[See Form 2, Schedule II CrPC]

To ..... (name and designation of person or persons who are about to execute the warrant).
Whereas (name of accused) of (address) stands charged with the offence of ..... (state the offence), you are hereby directed to arrest the said ....., and to produce him before me. Herein fail not.
Dated, this ..... day of ....., 20.....

(Seal of the Court)

(Signature)

এবার দেখা যাক গ্রেপ্তার নিয়ে ভারতীয় সংবিধানে কী বলা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হলে তাঁকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে [22(1)]। [22(2)] ধারা অনুসারে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হবে [22(2)]। আটক ব্যক্তিকে তার পছন্দমতো আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ দিতে হবে [22(1)]।

সাধারণভাবে সকল আটক ব্যক্তি এই অধিকারগুলি ভোগ করবে। তবে শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি [22(3)(a)] এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনে আটক ব্যক্তির [22(3)(b)] ক্ষেত্রে এই অধিকারটি প্রযোজ্য নয়। TADA, ESMA, MISA প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই অধিকারটি প্রযোজ্য নয়।

22 ধারার (Protection against arrest and detention in certain cases)-এর মর্মার্থ হল কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে না এবং বিচারকের আদেশ ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার বেশি হাজতে রাখা যাবে না। এই সুবিধা থেকে শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি [22(3)(a)] এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনে বন্দি [22(3)(b)] ছাড়া কারওকে বঞ্চিত করা যাবে না। দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা এবং বৃহত্তর নাগরিক স্বার্থে অপরাধের আশঙ্কাজনিত কারণেও শাসনবিভাগ কারওকে আটক করতে পারে এবং এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি 22 ধারার মৌলিক অধিকার দাবি করতে পারেন না, কারণ ব্যক্তির অধিকারের থেকে বড়ো সমষ্টির অধিকার, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের থেকে বড়ো দেশ ও জাতির স্বার্থ। ভারতীয় সংসদ বা রাজ্য আইনসভার দ্বারা প্রণীত বিনা বিচারে আটক রাখার এই আইনকে নিবর্তনমূলক আটক আইন বলা হয়। এইরূপ আইনের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়:

১. Preventive Detention Act, 1950 (P.D. Act) [Repealed]

২. Maintenance of Internal Security Act, 1971 [Repealed]

Criminal Procedure Code-এর Section 41 অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে 'warrent' ছাড়াই গ্রেপ্তার করা যায়:

- যদি cognizable বা বিচারযোগ্য অপরাধ হয়
- যদি কারও কাছে অবৈধভাবে house-breaking tool বা বাড়ি ভেঙে ঢোকার যন্ত্র থাকে
- রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত একজন অপরাধী
- চুরি করা দ্রব্য যদি কারও কাছে পাওয়া যায়
- পুলিশ অফিসারের কাজে কেউ যদি বাধা দেন
- ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে বেআইনিভাবে পালিয়ে এসেছেন (Army deserter)
- ভারতের বাইরে এমন কোনো অপরাধ করেছেন যা এদেশে শাস্তিযোগ্য
- বার বার যিনি অপরাধ করেন (repeat offender) কিন্তু ঠিকানা পরিবর্তন করলে কোর্টকে জানান না
- অন্য কোনো এলাকার পুলিশ অফিসার যদি অনুরোধ করেন (অর্থাৎ যে অপরাধী পালিয়ে বেড়াচ্ছেন)
- যিনি স্বভাবজাত অপরাধী (habitual offender) এবং আত্মগোপনের চেষ্টা করেছেন
- এমনকি non-cognizable অপরাধের ক্ষেত্রেও warrant ছাড়া গ্রেপ্তার করা যেতে পারে যদি পুলিশের সন্দেহ হয় যে অপরাধী মিথ্যা নাম ও ঠিকানা দিচ্ছেন।

সুপ্রিম কোর্টের মতে পুলিশের কাছে সন্তোষজনক যুক্তি থাকলে তবেই warrant ছাড়া গ্রেপ্তার করা উচিত।

অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট বা কর্তৃত্বযুক্ত পুলিশ অফিসারের warrant বলেই গ্রেপ্তার করা কর্তব্য। South Asia Human Rights Documentation Centre-এর মতে, "Illegal arrests are a problem in India" অর্থাৎ warrant ছাড়া গ্রেপ্তার বা অবৈধ গ্রেপ্তার ভারতে একটি সমস্যা। National Police Commission-এর তৃতীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভারতে ৬০ শতাংশ গ্রেপ্তার অপ্রয়োজনীয় বা অন্যায্য।

→ গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির অধিকার (Rights when Arrested)

- গ্রেপ্তারের কারণ জানবার অধিকার
- জামিন পাওয়ার অধিকার (এটি জামিন বা Bail অংশে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে)

- যিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁর বন্ধু, আত্মীয় বা কোনো নিকট ব্যক্তিকে জানাবার অধিকার
- Legal Aid বা আইনি সাহায্য পাওয়ার অধিকার

→ হাতকড়া পরানো (Handcuffing) নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ:

সুপ্রিম কোর্ট হাতকড়া পরানো প্রক্রিয়াটিকে অমানবিক ও অযৌক্তিক বলে নিন্দা করেছেন। প্রেমশঙ্কর শুক্লা বনাম দিল্লি প্রশাসন (১৯৮০) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট 'handcuffing'-কে "inhuman, unreasonable, over-harsh and arbitrary" আখ্যা দিয়েছেন।

কোর্টের মতে আটক ব্যক্তি যদি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন বা পালিয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তাহলেই হাতকড়া পরানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে পুলিশ অফিসারকে কারণ লিখে রাখতে হবে।

আটক হওয়া ব্যক্তির আরও কতকগুলি অধিকার:

- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করতে হবে।
- অপরাধী চিকিৎসকের পরামর্শ চাইলে তাঁর 'medical examination' করাতে হবে।
- অভিযুক্ত মহিলা হলে তাঁর শারীরিক তল্লাশি কোনো মহিলা অফিসারই করবেন।
- তাঁর জিজ্ঞাসাবাদও কোনো মহিলা পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে করতে হবে।
- অভিযুক্ত মহিলাকে পুরুষদের থেকে পৃথক হেফাজতে রাখতে হবে।
- খুন, ধর্ষণ, মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে 'medical examination' বাধ্যতামূলক।
- পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন প্রতি ৪৮ ঘণ্টা অন্তর সরকারি চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা হওয়া কর্তব্য।
- অভিযুক্ত ব্যক্তির গায়ে যদি ক্ষতচিহ্ন বা দাগ থাকে তা নথিভুক্ত করতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে ভারতীয় সংবিধানের Act 21 এবং 22-তে আটক ব্যক্তিকে কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেগুলি আবার ২০০৫ সালে Criminal Prodedure Code সংশোধন করে Section 50A-তে যোগ করা হয়েছে। D.K. Basu V. State of West Bengal মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে, "The arrested person should be informed of his or her right to have access to a lawyer of his or her choice. If the accused cannot afford a lawyer, he or she should be informed of his or her right to free legal aid." অর্থাৎ বিনা খরচায় তাঁকে আইনি সাহায্য দিতে হবে।

গ্রেপ্তারের পর শুরু হয় তদন্ত (Investigation)। এবিষয়েও অনেক বিধি-নিয়ম রয়েছে (তবে সিলেবাস বহির্ভূত বলে এটি আলোচনা করা হল না, আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা *Oxford Handbook*-টি দেখতে পারেন)।

• জামিন (BAIL)

সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় একটি মৌলিক নীতি হল এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তাঁকে নির্দোষ বলে বিবেচনা করা হবে এবং এমতাবস্থায় তাঁকে জামিন বা Bail দেওয়া সাধারণ নিয়ম। State of Rajasthan V. Balchand (1978) মামলায় কোর্ট বলেন, "A fundamental principle of the criminal justice system is that all defendents are innocent until proven guilty; accordingly, the granting of bail should be the rule rather than the exception."

Bail বা জামিনের সংজ্ঞা:

Bail বা জামিন হল একটি কোর্ট নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে অভিযুক্তকে সাময়িকভাবে হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া; তবে দুটি পূর্বশর্ত আছে: (১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনে আদালতে উপস্থিত হতে হবে এবং (২) সেটি না করলে জরিমানা হতে পারে। Bail bond একটি লিখিত দলিল— যার ভিত্তিতে জামিন দেওয়া হয়। Black's Law Dictionary অনুযায়ী, "Bail is a monetary amount or precondition for pre-trial release from custody. It is designed to ensure that the accused will return for subsequent proceedings and is granted by the execution of a bail bond. A bail bond is a written document that states that (a) the accused will appear at a designated proceeding when attendance is required and (b) failure to do so will require payment to the court, money in the amount specified in the order fixing bail."

অভিযুক্ত নিজে বা তাঁর surety (অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে তাঁর হয়ে দায়িত্ব নেবেন এমন কোনো ব্যক্তি) জামিন বন্ডে সই করতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি আদালতে হাজিরা না দেন তাহলে 'surety' দায়ী থাকবেন। সাধারণত পরিবারের কোনো সদস্য বা নিকট কোনো বন্ধু 'surety' হয়ে থাকেন। নীচে জামিন বন্ডের একটি নমুনা দেওয়া হল:

Bond and Bail Bond after Arrest

I, ... (name), of ....., being brought before the District Magistrate of ..... (or as the case may be) under a warrant issued to compel my appearance to answer to the charge of ....., do hereby bind myself to attend in the Court of ..... of the day of ..... next, to answer to the said charge, and to continue so to attend until otherwise directed by the Court; and, in case of my making default herein, I bind myself to forfeit, to Government, the sum of rupees.
Dated, this ..... day of ....., 20.....

(Seal of the Court)

(Signature)

I do hereby declare myself surety for the above-named ..... of ....., that he shall attend before ..... in the Court of ..... on the day of ..... next, to answer to the charge on which he has been arrested, and shall continue so to attend until otherwise directed by the Court; and, in case of his making default therein, I bind myself to forfeit, to Government, the sum of rupees.
Dated, this ..... day of ....., 20.....

(Signature)

গ্রন্থসূত্র: *Human Rights Handbook*

জামিনের টাকা যেন অভিযুক্তদের সামর্থ্যের মধ্যে হয়; এটি যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়।

জামিনযোগ্য অপরাধ (Bailable Offence) ও অ-জামিনযোগ্য অপরাধ (Non-Bailable)-এর মধ্যে পার্থক্য:

সাধারণত কম গুরুত্বপূর্ণ অপরাধগুলি (less serious offences) জামিনযোগ্য। গুরুতর অপরাধগুলি (serious offences) অ-জামিনযোগ্য। অ-জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে কোর্ট জামিন দিতে পারে যদি নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ হয়:

- অভিযোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব
- অভিযুক্তের কোনো বিশেষ অবস্থা
- তথ্যপ্রমাণের প্রকৃতি

- অভিযুক্ত আদালতে হাজিরা দেবেন কিনা তার নিশ্চয়তা
- অভিযুক্ত সাক্ষীদের ভয় দেখাবেন কিনা
- বৃহত্তর জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ একটি বিচার্য বিষয়
- অন্য কোনো শর্ত যেমন অভিযুক্তের criminal record অর্থাৎ অতীত অপরাধের কোনো ইতিহাস আছে কিনা।

এইসব বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে আদালতে জামিন অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রেও জামিন দিতে পারেন। তবে নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে কোর্ট কোনো অবস্থাতেই জামিন অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন দিতে পারবেন না:

- যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন কোনো অপরাধ করে থাকেন যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।
- যদি আগে অপরাধী অন্য কোনো মামলায়— যেখানে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সাত বছর বা তার বেশি কারাবাসের সাজা পেতে পারেন এমন কোনো মামলায় অভিযুক্ত আছেন।

তবে এসকল ক্ষেত্রেও কোর্টের একটা স্বেচ্ছাধিকার থেকেই যায় যেমন অভিযুক্ত যদি ষোলো বছরের নীচে নাবালক-নাবালিকা হয়; অসুস্থ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। সরকারি উকিল বা Public Prosecutor-এর বক্তব্য শুনে তবেই কোর্ট জামিন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন; এসব ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসারের জামিন দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই।

জামিন নানারকম হতে পারে:

- Personal bond বা ব্যক্তিগত বন্ড বা মুচলেখা
- Conditional bail বা শর্তসাপেক্ষ জামিন
- Anticipatory bail অর্থাৎ গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কাজনিত জামিন।

  Anticipatory bail পাওয়াটা কিন্তু কোনো অধিকার নয়; একমাত্র কোর্টই এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের ভাষায়, "... anticipatory bail is not a matter of right, but a discretionary power exercised by the court in each case. It occurs rarely and in exceptional circumstances."। Anticipatory bail একটি বিরল ও ব্যতিক্রমী ঘটনা।

সুপ্রিম কোর্ট anticipatory bail-এর ক্ষেত্রে কতকগুলি সাধারণ শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন:

- প্রস্তাবিত অভিযোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব
- গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনার ঘটনাক্রম

- আবেদনকারীর অতীত অপরাধের ইতিহাস (criminal history)
- অভিযুক্তের পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা
- অভিযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করে দেবেন কিনা বা সাক্ষীদের ভয় দেখাবেন কিনা
- জনস্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবে কিনা।

এইসব বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে তবেই কোর্ট anticipatory bail মঞ্জুর করবেন।

জামিন (bail) পাওয়ার পর:

জামিন পাওয়ার পর অভিযুক্তকে হেফাজত থেকে মুক্তি দিতে হবে তবে মুচলেখা (bond)-য় চিহ্নিত স্থানে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে এবং তদন্তে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোর্ট (কোনো পুলিশ অফিসার নন) জামিন নাকচ (cancel) করতে পারেন:

- জামিনের অপব্যবহার করে অভিযুক্ত আরও কোনো অপরাধমূলক কাজ করছেন
- জামিন পাওয়া অবস্থায় তদন্তের বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন
- সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করছেন
- সাক্ষীদের ভয় দেখাচ্ছেন
- দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে
- অভিযুক্ত গোপন আস্তানায় গা-ঢাকা দিতে পারেন (can go underground)
- জামিনে যিনি 'surety' দাঁড়িয়েছেন তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছেন বা যেতে পারেন।

উপরিউক্ত কারণে 'bail' বা 'anticipatory bail' উভয়ই কোর্ট নাকচ করে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে আইনের ভাষাটি নিম্নরূপ: "After being released on bail, the accused is mostly free to carry on with life. However, the accused must attend court at the time and place specified in the bail bond. During this time, the accused should not in anyway interfere with the investigation of the case or attempt to abscond, doing so may result in cancellation of bail."

• তল্লাশি (SEARCH) বা খোঁজ

একটি তদন্ত চলাকালীন আইনি প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের নথি ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রয়োজন হতে পারে। বিধি অনুযায়ী যাঁদের কাছে এধরনের বিচার বিভাগের জন্য দরকারি জিনিসপত্র রয়েছে তা যথাস্থানে জমা করে দেওয়া। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নথি বা দরকারি সামগ্রী জমা না করেন তাহলে পুলিশকে 'Search Warrant' বা তল্লাশি করার পরোয়ানা ইস্যু করতে পারে তদন্তের স্বার্থে। নীচে একটি Search Warrant-এর নমুনা দেওয়া হল:

Search Warrant-এর নমুনা

Example of Warrant of Search
a Particular Offence [See Form No. 10, Sch. 2 CrPC]

To ..... (name and designation of police officer person or persons who is or are to execute the warrant).
Whereas information has been laid (or complaint has been made) before me of the commission (or suspected commission) of the offence of ..... (mention the offence concisely), and it has been made to appear to the inquiry now being made (or about to be made) into the said offence (or suspected offence).

This is to authorise and require you to search for the said ..... (the thing specified) in the ..... (describe house or place or part thereof to which the search is to be confined), and, if found, to produce the same forthwith before this Court, returning this warrant, with an endorsement certifying what you have done under it, immediately upon its execution.
Dated, this ..... day of ....., 20.....

(Seal of the Court)

(Signature)

গ্রন্থসূত্র: *Oxford Handbook of Human Rights and Criminal Justice* (South Asia Human Rights Documentation Centre)

নিম্নলিখিত স্থানে তল্লাশি চালানো যেতে পারে— যথা বাড়ি, ঘর, তাঁবু, গাড়ি বা জলযান।

একটি পুলিশি তদন্ত চলাকালীন নানা ধরনের নথিপত্র (document) বা দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হতে পারে। যাঁদের কাছে এগুলি রয়েছে তাঁরা যদি বিধিসম্মত উপায়ে তা জমা না করেন তাহলে পুলিশ অফিসার 'warrant' বা কোর্ট শমন (summons) জারি করতে পারেন। আইনের পরিভাষায়, "A summons is a court order which can be used to compel a person to appear before the court to either give testimony or produce a thing." অর্থাৎ শমন হল কোর্টের একটি নির্দেশ যার দ্বারা একজন ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত থেকে সাক্ষ্য দিতে বা কোনো দ্রব্য জমা দিতে বাধ্য করা যেতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানে Art 20(3)-তে 'Right against Self-incrimination' প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিকে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যায় না। অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারার অপব্যবহার করেন। তাই এবিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ হল কোর্ট-ই ঠিক করবে 'Self-incrimination' বা নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া বলতে

একটি বিশেষ মামলায় কী বোঝায়। ইচ্ছাকৃতভাবে নথি জমা না দেওয়া IPC-এর Section 175 অনুয়ায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।

তল্লাশি পরোয়ানা কী এবং কেন তা ইস্যু করা হয় (What is Search Warrant and why it is issued)

তল্লাশি পরোয়ানা হল একটি লিখিত নির্দেশ বা কর্তৃত্ব যা একজন পুলিশ অফিসারকে দেওয়া হয় অবৈধভাবে রক্ষিত কোনো নথি বা ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার জন্য (A Search Warrant is a written authority given to a police officer or other competent official to search for documents or persons wrongfully detained.)

নিম্নলিখিত কারণে Search Warrant ইস্যু করা হয়:

- কোর্ট মনে করছেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি শমন জারি করা সত্ত্বেও হাজিরা দেবেন না বা দরকারি নথি পেশ করবেন না।
- কোনো একটি নথি বা দ্রব্যের অনুসন্ধানের জন্য।
- কোর্ট মনে করছেন যে তদন্তের স্বার্থে এরকম একটি warrant ইস্যু করা জরুরি।
- কোর্ট মনে করছেন যে কোনো একটি গোপন জায়গায় চুরি করা সম্পত্তি বা নথি লুকানো আছে।
- কোর্ট মনে করছেন যে সংবাদপত্র, বই বা অন্য কোথাও এমন কিছু প্রকাশিত হতে চলেছে যা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক বা জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে।
- কোর্ট মনে করছেন যে একজন ব্যক্তিকে বিশেষ করে একজন মহিলা বা শিশুকন্যাকে অপহরণ করে রাখা হয়েছে ও তাঁর খোঁজ করা দরকার।

CrPC-এর Section 93(1) অনুসারে কোর্ট সবসময় এরূপ search warrant ইস্যু করতে বাধ্য নন, তবে মামলার অবস্থা বিবেচনা করে ইস্যু করতেই পারেন। Search Warrant ইস্যু করলে পুলিশ অফিসার সেই অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য।

Search Warrant ছাড়া তল্লাশি

কোনো কোনো ব্যতিক্রমী অবস্থায় search warrant ছাড়াই পুলিশ অফিসাররা তল্লাশি চালাতে পারেন। যথা:

- যখন তদন্তকারী অফিসারের হাতে arrest warrant রয়েছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন।

থানার ও.সি. বা তদন্তকারী অফিসার যদি মনে করেন যে

ক) একটি দরকারি দ্রব্য তাঁর এলাকায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

খ) তল্লাশি চালাতে বিলম্ব করলে তদন্তের ক্ষতি হতে পারে।

- ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর উপস্থিতিতে search warrant ছাড়াই তল্লাশির নির্দেশ দিতে পারেন।

তবে এই ধরনের warrant ছাড়া তল্লাশির আগে পুলিশ অফিসারকে লিখিতভাবে তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে। যাঁর বাড়ি বা জায়গা তল্লাশি করা হল তাঁকে একটি রেকর্ড-এর 'free copy' দিতে হবে।

South Asia Human Rights Documentation Centre-এর বক্তব্য অনুযায়ী, "In practice, the police usually do not obtain search warrant. Sometimes they use Sch. 165 CrPC to claim that an accused will escape arrest or that a search object will disappear." অর্থাৎ বাস্তবে পুলিশ এ-জাতীয় সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই তল্লাশি চালায় এই যুক্তিতে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিযে যেতে পারেন বা কোনো বিশেষ জিনিস বা নথি লোপাট করা হতে পারেন। CrPC-র Sec. 165 ধারা বলে পুলিশ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে। তল্লাশির কতকগুলি নিয়ম আছে। দুজন স্থানীয় সাক্ষীর সামনে পুলিশকে এই তল্লাশি চালাতে হবে। IPC-র Sec. 187 অনুসারে উপযুক্ত কারণ ছাড়া কেউ সাক্ষী হতে অস্বীকার করতে পারেন না। যেসব দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হল তার তালিকা গৃহকর্তা বা কর্ত্রীকে দিতে হবে। গৃহকর্তা বা কর্ত্রী সার্চ করতে দিতে বাধ্য; প্রয়োজনে পুলিশ বলপ্রয়োগ করতে পারে।

একটি অবৈধ তল্লাশি (Illegal Search) নিম্নলিখিত কারণে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে:

- যে আইন বলে তল্লাশি করা হচ্ছে সেটি অসাংবিধানিক।
- ম্যাজিস্ট্রেটের স্বেচ্ছাধীন বিচার বিভাগীয় ছাড়পত্র ছাড়াই সার্চ ওয়ারেন্টটি ইস্যু করা হয়েছে।
- আইনগত শর্ত না মেনে সার্চ ওয়ারেন্টটি ইস্যু করা হয়েছে।
- ওয়ারেন্ট-টি CrPC-এর Sec. 100 ও Sec 165-এর বিরোধী।
- অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ওয়ারেন্টটি ইস্যু করা হয়েছিল।

একজন ব্যক্তির অধিকার আছে একটি অবৈধ তল্লাশিতে বাধা দান করার কিন্তু এটি যেন আইনসম্মত হয়। বাধা দান করতে গিয়ে পুলিশ অফিসার যদি আহত হন তাহলে ফৌজদারি অভিযোগ আনা যেতে পারে। একটি অবৈধ তল্লাশির মাধ্যমে যে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়

তা আদালতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পেশ করা যেতে পারে কিন্তু কোর্টের ভাষায় "such evidence is viewed with caution."

তল্লাশির সময় ভারপ্রাপ্ত তদন্তকারী অফিসার নিজে উপস্থিত থাকবেন এবং সমস্ত কিছু লিখিতভাবে নথিবদ্ধ করে রাখবেন।

ভারপ্রাপ্ত অফিসারের পক্ষে নিজে যদি তল্লাশি করা সম্ভব না হয় তবে তিনি তাঁর অধস্তন কোনো অফিসারকে দিয়ে তদন্ত করাতে পারেন। দণ্ডবিধি অনুযায়ী, "(The officer) must authorize a subordinate officer to conduct the search after specifying, in writing, the place of search and thing(s) for which the search is to be made."

• বাজেয়াপ্তকরণ (SEIZURE)

আইনগত বা বৈধ প্রক্রিয়ায় কোনো আধিকারিক কর্তৃক কোনো সম্পত্তির দখল নেওয়াকে বাজেয়াপ্ত করা বা Seizure বলে। *Human Rights Handbook* অনুযায়ী, "Seizure means taking possession of property by an officer under legal process." Criminal Procedure Code-এর Section 102 অনুযায়ী একজন পুলিশ অফিসারের তল্লাশি করার ক্ষমতার সঙ্গে সন্দেহজনক জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও নিহিত রয়েছে। অফিসার যদি মনে করেন যে দ্রব্যটি চুরি করা হয়েছে বা জিনিসটির দ্বারা কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বা হতে পারে তাহলে তাঁর সেটি দখল নেওয়ার বৈধ অধিকার আছে। CrPC-এর Section 51 অনুযায়ী একজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হওয়ার পর যদি জামিন না পান তাহলে তাঁর সঙ্গে পাওয়া জিনিসপত্রাদি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে।

তবে তল্লাশির সময় যে জিনিসগুলি বাজেয়াপ্ত করা হল তার একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দিতে হবে— সাক্ষীদের উপযুক্ত স্বাক্ষরসহ। তাছাড়া যে দ্রব্যগুলির দখল নেওয়া হল তা এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে। CrPC-এর Section 104 অনুযায়ী, "The Court can also impound any documents or objects produced before it as the result of a seizure." যদি প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় তবে ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিতে পারেন দ্রব্যটি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে। যদি মালিকের পরিচিতি না জানা থাকে তবে তা ছয় মাস পর্যন্ত সরকারের কাছে থাকবে। তবে CrPC-এর Section 457 অনুসারে এসব করার আগে ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেবেন। ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যদি কোনো ন্যায্য দাবিদার না আসেন তবে বাজেয়াপ্ত দ্রব্যাদি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশানুসারে সরকারি হেফাজতে জমা পড়বে এবং সরকার ইচ্ছা করলে এটি বিক্রয় করে দিতে পারেন।

প্রমাণ (Evidence) সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য.

Indian Evidence Act, 1872 অনুযায়ী প্রমাণ নানা ধরনের হতে পারে:

- মৌখিক প্রমাণ (oral evidence)
- নথিভুক্ত প্রমাণ (documentary evidence)
- বিশেষ অবস্থা-সংক্রান্ত প্রমাণ (circumstanctial evidence)

Indian Evidence Act 1872-এর Section 24 অনুসারে পুলিশি অত্যাচারের দ্বারা অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি আদালতে গ্রাহ্য হবে না। *Human Rights Handbook* অনুযায়ী, "Police Officers have been and should be prosecuted and punished for torturing suspects during interogation or questioning. Confessions obtained by use of such methods should be excluded as evidence at trial." Sec. 24-এ আরও বলা হয়েছে যে প্রলোভন (inducement), ভীতি প্রদর্শন (threat) বা প্রতিশ্রুতি (promise)-র দ্বারা আদায়ীকৃত কোনো স্বীকারোক্তি প্রমাণ (evidence) হিসাবে ফৌজদারি মামলায় গ্রাহ্য হবে না। একমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তি আদালতে গ্রাহ্য হবে। এক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা করবেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর স্বীকারোক্তির অর্থ বুঝতে পেরেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জানাবেন যে তিনি আইনত স্বীকার করতে বাধ্য নন। Criminal Procedure Code-এর Sec. 164 অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তি ও ম্যাজিস্ট্রেট উভয়ে স্বীকারোক্তিটিতে স্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষর করার আগে অভিযুক্তকে স্বীকারোক্তটি পড়ে শোনাতে হবে এবং যে কোনো ব্যাখ্যা চাইলে তা দিতে হবে। Sec. 164 অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলে তবেই তিনি স্বীকারোক্তিটি প্রমাণ বা evidence হিসেবে যে ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করছেন তাঁর কাছে বিষয়টি পাঠাতে পারবেন।

তথ্যসূত্র:

১। Nariman, Fali. S., *India's Legal System*.

২। বসু, দুর্গাদাস, *ভারতীয় সংবিধান পরিচয়*।

৩। *Handbok of Human Rights and Criminal Justice in India* (South Asia Human Rights Documentation Centre, Oxford University Press), 3rd ed.

৪। *Indian Penal Code*, 1860.

৫। *Criminal Procedure Code*, 1973.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় দণ্ডবিধির কিছু অপরাধ সম্পর্কে ধারণা (Offences under IPC)

Sir William Blackstone তাঁর সুপ্রসিদ্ধ *Commentaries on Law of England*-এ অপরাধ বা crime-এর সংজ্ঞা দিয়ে বলেছিলেন, "(it) is an act committed or omitted in violation of public law forbidding or commanding it." সরকারি আইন দ্বারা যা নিষিদ্ধ তা করা বা যা নির্দেশিত তা না করাই হল crime বা অপরাধ।

যেহেতু 'crime' কথাটির সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই, তাই Indian Penal Code (1860)-এ 'crime'-এর পরিবর্তে 'offence' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। IPC-এর Section 40-তে Offence বা অপরাধের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে যে, "Offence is an act punishable by the code. An offence takes place in two ways, either by commission of an act or by omission of an act." অর্থাৎ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী 'অপরাধ' হল এমন একটি কাজ যা দণ্ডবিধি দ্বারা দণ্ডনীয়। অপরাধ দুভাবে ঘটতে পারে— by commission কিছু করে অথবা বা by omission অর্থাৎ যেটা করা উচিত সেটা না করে।

অপরাধ দু'ধরনের হতে পারে— (১) Cognizable offence বা গুরুতর অপরাধ এবং (২) Non-cognizable offence বা অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অপরাধ।

Cognizable offence হল এমন গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ যা সমাজের পক্ষে তাৎক্ষণিক বিপদ ডেকে আনে যেমন খুন, ধর্ষণ বা ডাকাতি— এসব ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়াই তদন্ত করতে পারেন এবং সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। অন্যদিকে non-cognizable offence হল সেই ধরনের অপরাধ যেগুলি অপেক্ষাকৃতভাবে কম গুরুতর বা কম বিপজ্জনক যেমন আদালতের মানহানি। এক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করতে হলে warrant প্রয়োজন ও তদন্ত করতে হলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ প্রয়োজন। Cognizable কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'able to be apprehended'। Criminal Prodcedure Code-এর Section 2(c)-তে বলা হয়েছে, "'Cognizable

offence' means an offence for which, and 'cognizable case' means, a case in which a police officer may, ... arrest without warrant."

Cognizable অপরাধের উদাহরণ হল:

১। খুন (Murder, Sec. 302 IPC)

২। পণ-সংক্রান্ত মৃত্যু (Dowry death, Sec. 301-B IPC)

৩। অপহরণ (Kidnapping, Sec. 363 IPC)

৪। চুরি (Theft, Sec. 379 IPC)

৫। ধর্ষণ (Rape, Sec. 376 IPC)

৬। ভারতীয় মুদ্রা বা নোটের জাল করা (Counter-feiting Indian coins, currency notes or bank notes, Sec. 489A IPC)

৭। দাঙ্গা (Rioting, Sec. 147 IPC) ইত্যাদি।

(Criminal Procedure Code-এর First Schedule বা প্রথম তালিকায় সমস্ত অপরাধগুলি লিপিবদ্ধ আছে)।

বলা হয়েছে যে, "Non-cognizable offence are more trivial and less serious than cognizable ones. In the former, the police will not interfere or arrest the offender without a warrant." অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অপরাধগুলিকে non-cognizable অপরাধ বলা হয়। এগুলির ক্ষেত্রে পুলিশ warrant ছাড়াই গ্রেপ্তার বা তদন্ত করতে পারে না। Non-cognizable অপরাধের কয়েকটি উদাহরণ হল:

১। সরকারি কর্মচারী অবৈধভাবে যদি কোনো বাণিজ্যে যুক্ত থাকেন (Public officer unlawfully engaging in any trade, Sec. 168 IPC)

২। শমন অনুযায়ী হাজিরা না দেওয়া (Absconding to avoid service of summons, Sec. 172 IPC)

৩। সরকারি কর্মচারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য দেওয়া (Knowingly furmishing false information to a public servant, Sec. 177 IPC)

৪। সরকারি কর্মচারীকে কাজ করতে বাধা দেওয়া (Obstructing a public servant in discharge of his public functions, Sec. 186 IPC)

৫। লটারি অফিস খোলা (Keeping a lottery office, Sec. 494A IPC)

৬। হিসাবপত্রের গরমিল করা (Falsification of accounts, Sec. 477A IPC)

৭। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক আবহাওয়া তৈরি করা (Making atmosphere obnoxious to health, Sec. 278 IPC) ইত্যাদি।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ (Offences Against the State)

Sec. 121 IPC— ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেষ্টা বা যুদ্ধ করতে ইন্ধন জোগানো।

Sec. 121A IPC— রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য ষড়যন্ত্র করা।

Sec. 122 IPC— ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করা।

Sec. 123 IPC— যুদ্ধ করার জন্য আত্মগোপন করা।

Sec. 124 IPC— রাষ্ট্রপতি বা কোনো রাজ্যপালকে আক্রমণ বা আঘাত করা।

Sec. 124A IPC— রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

Sec. 125 IPC— ভারতের কোনো বন্ধু রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা।

Sec. 126 IPC— কোনো বন্ধু রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে উৎপাত করা।

Sec. 127 IPC— 125 ও 126 ধারায় বর্ণিত কার্যাবলি থেকে সম্পত্তি সংগ্রহ করা।

Sec. 128 IPC— যুদ্ধবন্দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা।

Sec. 129 IPC— কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তৃক যুদ্ধবন্দিকে অসাবধানতাবশত পালিয়ে যেতে দেওয়া।

Sec. 130 IPC— এরূপ যুদ্ধবন্দিকে সাহায্য করা বা আশ্রয় দেওয়া।

বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ (Offences Relating to Marriage)

Sec. 493 IPC— ছলচাতুরি করে কোনো মহিলাকে বিবাহিত বলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে তাঁর সাথে সহবাস করা।

Sec. 494 IPC— স্ত্রী বা স্বামী থাকাকালীন পুনরায় বিবাহ করা।

Sec. 495 IPC— পূর্বোক্ত অপরাধ গোপন রাখা।

Sec. 496 IPC— ঠকানোর উদ্দেশ্যে বিবাহের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।

Sec. 497 IPC— ব্যভিচার।

Sec. 498 IPC— অপরাধ করার উদ্দেশ্যে কোনো বিবাহিত মহিলাকে আটকে রাখা বা তাঁকে প্রলুব্ধ করা।

জামিনযোগ্য অপরাধ (Bailable Offence) ও অ-জামিনযোগ্য অপরাধ (Non-Bailable)-এর মধ্যে পার্থক্য:

Criminal Procedure Code-এর Section 2(a) ধারা অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC)-র অন্তর্গত সমস্ত অপরাধকে 'bailable' বা জামিনযোগ্য এবং 'non-bailable' বা জামিন অযোগ্য— এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। *Human Rights Handbook*-এর ভাষায় সহজ করে বলা যায়, "... there is a general rule that more serious offences will be classified as non-bailable, while less serious offences will be classified as bailable" অর্থাৎ একটি সাধারণ নিয়ম হল এই যে গুরুতর অপরাধগুলিকে জামিন অযোগ্য ও অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অপরাধগুলিকে জামিনযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

Criminal Procedure Code-এর Section 436(1)-তে বলা হয়েছে যে Bailable offences are generally less serious offence for which being granted bail is a right. অর্থাৎ জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন পাওয়া একটি অধিকার। অপরদিকে গুরুতর জামিন-অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন পাওয়া বা না পাওয়া কোর্টের discretion বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে; এসব ক্ষেত্রে জামিন পাওয়া কোনো অধিকার নয় (the granting of bail is not a matter of right)।

এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন একই মোকদ্দমা (Case)-য় cognizable এবং non-cognizable উভয় অপরাধই জড়িয়ে থাকতে পারে; সেক্ষেত্রে অপরাধটি cognizable বলে বিবেচিত হবে।

তথ্যসূত্র:

১। *Indian Penal Code*, 1860.
২। *Criminal Procedure Code*, 1973.
৩। *Handbok of Human Rights and Criminal Justice in India* (South Asia Human Rights Documentation Centre, Oxford University Press).
৪। Nariman, Fali. S., *India's Legal System*, 3rd ed.

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের ব্যক্তিগত ও প্রথাগত আইন
(Personal and Customary Laws in India)

Personal Law বা ব্যক্তিগত আইন বলতে বোঝায়, "part of law that deals with matters pertaining to a person and his or her family."

ভারতবর্ষ বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যক্তিগত আইন তাই এদেশে ভিন্ন প্রকৃতির। নীচে কয়েকটি ব্যক্তিগত আইনের উল্লেখ করা হল:

- The Converts' Marriage Dissolution Act, 1866
- The Indian Divorce Act, 1869
- The Indian Christian Marriage Act, 1872
- The Kazis Act, 1880
- The Anand Marriage Act, 1909
- The Indian Succession Act, 1925
- The Child Marriage Restraint Act, 1929
- The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936
- The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939
- The Special Marriage Act, 1955
- The Foreign Marriage Act, 1969
- The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Ordinance
- The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956
- Guardians and Wards Act, 1890
- The Hindu Minority and Guardianship Act, 1856
- The Indian Succession Act, 1825, amended in 1991 and 2002

আগেই বলা হয়েছে, ভারত বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ, এখানে প্রায় প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক ব্যক্তিগত আইন আছে। সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে অভি

দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code)-এর আদর্শ ঘোষিত হলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। এই অধ্যায়ে আমরা দুটি প্রধান সম্প্রদায়— হিন্দু ও মুসলিমদের ব্যক্তিগত আইন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

হিন্দু ব্যক্তিগত আইন (Hindu Personal Laws)

১৯৪৭ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন রচনায় প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। 'Hindu Code Bill' নামাঙ্কিত ব্যক্তিগত আইনের প্রস্তাব নিয়ে ১৯৪৭ সাল থেকে আলোচনা শুরু হয়েছিল— দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও কিন্তু হিন্দু কোড বিল নিয়ে জটিলতা কাটেনি। অবশেষে সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী হিন্দু কোড বিলকে ভাগ করা হল: হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫; হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬; হিন্দু নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬; হিন্দু দত্তক ও ভরণ-পোষণ আইন, ১৯৫৬।

সংবিধানে সাধারণ দেওয়ানি বিধির নির্দেশ মেনে উপরোক্ত আইনগুলি শুধুমাত্র হিন্দু মতাবলম্বী মানুষই নয়— অন্য সম্প্রদায় যথা বীরাশৈব, লিঙ্গায়ত, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় যাদের ব্যবহৃত প্রথার মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব আছে তারা সকলেই এই আইনের আওতায় পড়বে। এই আইন থেকে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান সম্প্রদায়, খ্রিস্টান ও পারসি ধর্মাবলম্বী মানুষ বাদ থাকবে। আমাদের দেশে খ্রিস্টান (১৮৭২) ও পারসি (১৯৩৬) সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য লিখিত ব্যক্তিগত আইন ছিল। স্বাধীনতার পর হিন্দুদের জন্য আইন পাশ হল।

কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীমতী চান্দ্রেয়ী আলম মন্তব্য করেছেন যে তিনটি আইনই একটি সূত্রে বাঁধা। অর্থাৎ বিয়ের বয়স পাত্রীদের ক্ষেত্রে ১৮ এবং পাত্রের ক্ষেত্রে ২১ বছর; স্বামী বা স্ত্রী বর্তমান থাকাকালীন দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ; পাত্র বা পাত্রী যেন মানসিক ভারসাম্যহীন না হয়; এবং বিবাহ যেন নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে না হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান হবে নিজস্ব পারিবারিক রীতি মেনে। সরকার দ্বারা নিযুক্ত Marriage Registration Officer-এর কাছে নথিভুক্তিকরণ করতে হবে। একমাত্র ১৯৫৪ সালের Special Marriage Act বা বিশেষ বিবাহ আইন অনুযায়ী বিয়ে হলে রেজিস্ট্রারের সামনে সই ও শপথ করে বিয়ে হয়। এই আইনটি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। যে কোনো ভারতীয় নাগরিক একে অপরকে বিয়ে করতে পারে। Hindu Marraige Act 1955; Indian Divorce Act, 1872; Special Marriage Act 1954 ইত্যাদিতে বিবাহ বিচ্ছেদের আইনে সামঞ্জস্য আছে। এইসব আইন অনুযায়ী নিষ্ঠুর আচরণের জন্য, কোনো পক্ষ অপর পক্ষের সংস্রব ত্যাগ করলে, ব্যভিচারে লিপ্ত থাকলে, বা ধর্ম ত্যাগ করলে কিংবা এমন মানসিক রোগ বা জড়তায় আক্রান্ত যার কোনো চিকিৎসা নেই এবং যে-ব্যাধি থাকার দরুণ

অপরের সাথে বাস করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে বিচ্ছেদ আইনত গ্রাহ্য। ২০০৬ সালের শিশু বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইনে শিশু বিবাহের শিকার কোনো মেয়ের বিয়ে অস্বীকার করার অধিকার রয়েছে।

হিন্দু দত্তক ও ভরণ-পোষণ আইন অনুযায়ী স্ত্রীর ও সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্বামীর মৃত্যু হলে তার বাবার। পুত্রসন্তান নাবালক থাকাকালীন ভরণ-পোষণ পাবে। এছাড়া বিবাহ আইনে কোনো দরখাস্ত করলে ভরণ-পোষণের আদেশ আদালত দেবে। কোনো বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা হলে তবেই আদালত ভরণ-পোষণের আদেশ দেবে। ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন পাস হয়। কোনো হিন্দুর যদি ইচ্ছাপত্র না থাকে তাহলে তার সম্পত্তি কীভাবে বর্তাবে তার বিশদ বিবরণ ওই আইনে দেওয়া আছে। এই আইন বলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দায়ভাগ, মিতাক্ষরা প্রভৃতি আইনের মধ্যে সমতা আনা হয়েছে ও মহিলা উত্তরাধিকারীকে বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন (Muslim Personal Laws)

ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও মুসলিম ব্যক্তিগত আইন একটি স্পর্শকাতর বিষয় কারণ এর সাথে সংখ্যালঘু মানুষের Identity বা পরিচিতির প্রশ্ন জড়িত। প্রসিদ্ধ আইনজীবী চান্দ্রেয়ী আলমের মতে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো লিখিত আইন নেই। ১৯৩৭ সালে শরিয়ত আইন অনুযায়ী ইসলাম বিশ্বাসী মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়, যথা, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের হেফাজত, শরিয়তের বিধান মেনে চলবেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পত্তির ভাগ হয় পবিত্র কোরান শরিফের নির্দেশ মেনে। Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 অনুযায়ী কেবলমাত্র মুসলিম মেয়েরা আদালতে যেতে পারবে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য। পুরুষদের তালাকের প্রয়োজন হলে কিন্তু আদালতে যাবার কোনো প্রয়োজনই থাকে না। তিন তালাক উচ্চারণ করলেই, বিয়ের বাঁধন ছিন্ন হয়। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট 'instant triple talaq' বা তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ করেছেন।

সুপ্রিম কোর্ট তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথাকে "manifestly arbitrary, illegal and void" বলে আখ্যায়িত করেছে। মোদি সরকার The Muslim Women (Protection of Rights of Marriage) Second Ordinance 2019 জারি করে তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা বন্ধ করে দিয়েছে। স্বভাবতই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথাগত আইন বলতে সেই আইনকে বোঝায় যেটি সেই দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত এবং বিধিব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (Customary Law is any law that has been incorporated in the law of the land due to it being a tradition)। অর্থাৎ একটি দীর্ঘ দিন থেকে চলে আসা ঐতিহ্যকে আইনগত মান্যতা দেওয়াই হল প্রথাগত

আইন। ভারতীয় বিধিব্যবস্থায় প্রথাকে আইনের একটি প্রধান উৎস বলে ধরা হয়। সংবিধানের Art. 13(1) উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবিধান প্রণীত হবার অনতিকাল পূর্বে যে-সকল আইন রূপায়িত হয়েছে, তা যদি মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে অসঙ্গতিপূর্ণ অংশটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে। ১৩ নং ধারার আইনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমস্ত অর্ডিন্যান্স, নীতি, প্রথা এবং সংবিধান প্রণীত হবার আগে ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত উপযুক্ত আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে বোঝানো হয়েছে। aThe Constitution defines 'Law' to include "custom or usage having in the territory of India the force of law." ভারতের বিচারালয় প্রথাকে আইন বলে স্বীকৃতি দিয়েছে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে:

১। যদি প্রথাটি প্রাচীন (ancient) হয় বা স্মরণাতীত কাল থেকে (immemorial) চলে আসছে।

২। প্রকৃতিতে যুক্তিসঙ্গত (reasonable in nature) এবং ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে; এবং

৩। প্রথাটি নিশ্চিত (certain)।

কোর্টের মতে একটি প্রথা দীর্ঘদিন ধরে মান্যতা পেয়ে আইনের আকার বা মর্যাদা লাভ করে।

ভারতের সংবিধানে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির প্রথাগুলিকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে Art 244, 244A, 371A এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপশিলে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপশিলে উত্তর-পূর্ব ভারত ও অন্যান্য আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তাদের প্রচলিত প্রথাগুলিকে মান্যতা দানের ব্যবস্থা আছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির অরণ্যের উপর প্রথাগত অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে। The Scheduled Tribes And Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006-এ এই অধিকার দেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। আলম, চান্দ্রেয়ী, 'নারী ও আইন', রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত *মানবী বিদ্যা* গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধ।

২। *The Hindu Marriage Act, 1955.*

৩। *Shariat Act, 1937.*

৪। *ভারতীয় সংবিধান* (সর্বশেষ সংস্করণ)।

৫। Sharma, Basant, K., *Hindu Law.*

৬। Roy, Shibani and Rizvi, S.H.M., *Tribal Customary Laws of North-East India.*

৭। Narwani, G.S., *Tribal Law in India.*

চতুর্থ অধ্যায়

পণপ্রথা, যৌন হেনস্থা ও নারী উৎপীড়ন সংক্রান্ত আইন (Laws relating to Dowry, Sexual Harassment and Violence Against Women)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত হয় রাষ্ট্রসংঘ বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। সমগ্র বিশ্বে দীর্ঘদিনের ধ্বংস ও সৃষ্টির অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চারিত হয় নতুন মূল্যবোধ, মানবাধিকার সম্পর্কে বোধোদয়। অতএব মানবাধিকার সনদের প্রথমেই ঘোষণা করা হল যে, "All human beings are born free and equal in dignity and rights." বা সব মানুষই জন্ম থেকে স্বাধীন এবং সমানাধিকার ও সম্মানের অধিকারী হবে। নারী-পুরুষ উভয়কে নিয়েই মানবসমাজ, কিন্তু বিশ্বের কোনো সমাজেই নারী-পুরুষের সমানাধিকার এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা পুরুষশাসিত সমাজে নারী-পুরুষের সমান অবস্থান এখনও অধরাই রয়ে গেছে। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি সর্বত্রই নারী বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। ক্ষমতার প্রয়োগে নারীর প্রতি পীড়ন সমাজের নানান স্তরে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয় যেমন, পণপ্রথা, যৌন হেনস্থা, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে আমরা নারী অধিকার রক্ষার্থে তিন প্রকার আইন নিয়ে আলোচনা করব।

- পণপ্রথা বিরোধী আইন
- যৌন হেনস্থা সংক্রান্ত আইন
- নারী উৎপীড়ন সংক্রান্ত আইন

পণপ্রথা বিরোধী আইন (Dowry Prohibition Act)

হিন্দুশাস্ত্রের একটি অপব্যাখ্যা হল সবস্ত্রা সালংকারা মেয়েকে সম্প্রদান করতে হয়। এইভাবেই শুরু হয় পণপ্রথা। নতুন সংসারে মেয়েটি যাতে সসম্মানে থাকতে পারে বা যত বেশি খরচ করা যাবে তত ভালো পাত্র (বাজারি অর্থে) পাওয়া যাবে এবং সমাজে মেয়ের

বাবার সম্মান আরও বৃদ্ধি পাবে— পণের পরিমাণ স্থির করবার জন্যএই ছিল মূল বিবেচ্য বিষয়। এবং এর থেকেই যত দাবি। দাবি মেটাতে না পারার জন্য মেয়েটির ওপর অত্যাচার। ছেলের জন্য পণ আদায় করে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া বা মেয়ের বিয়েতে খরচ হয়েছে বলে ছেলের বিয়েতে পণ নিয়ে এর উশুল করতে হবে এই মানসিকতাই হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। লোভের এই ট্র্যাডিশন একবিংশ শতাব্দীতেও সমানে চলছে।

National Crimes Statistics Bureau অনুযায়ী প্রতি বছর আট হাজার 'dowry death' বা পণপ্রথা জনিত কারণে মৃত্যু ঘটে থাকে। Rebecca Bundhun লিখেছেন, "It is supposedly illegal but a spate of deaths linked to India's dowry system shows the practice is not only widespread but shows little sign of abating ... Women have committed suicide because they could not face harassment over dowry payment. Others have been murdered by their husband or in-laws by their dowry demands." (www.thenational.ae/ world)

Subramanya Sirish Tamvada, dean of IFIF Law College, Bangalore পণপ্রথাকে ভারতীয় সমাজে 'plague' মহামারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "It affects each and every part of our society, whether you're rich or poor." গরীব, বড়োলোক— সবাই এই পণপ্রথার শিকার এবং সমাজের প্রত্যেক অংশে এই অশুভ প্রথাটি প্রবেশ করেছে। নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী লোকসভায় কিছু দিন আগে স্বীকার করেন যে 2012 থেকে 2014-এর মধ্যে 25,000 মহিলা হয় আত্মহত্যা করেছেন অথবা পণপ্রথার কারণে খুন হয়েছেন।

Reported Facts			
	2001		2012
Dowry deaths	6,851		8,233
Pending Trial	21,922		27,969
Cases with drawn		1,389	
Convictions	44		668

গ্রন্থসূত্র: *National Crimes Record Bureau*

উপরে প্রদত্ত টেবিল থেকে একথা পরিষ্কার যে পণপ্রথার কারণে বধূহত্যা বেড়েই চলেছে। Monmayee Basu তাঁর *Hindu Women and Marriage Law* বইতে লিখেছেন, "During the mid-twentieth century and even later, the dowry system became an evil of tremendous magnitude, particularly after the

influx of business and black money into the country. Dowry no longer remained a voluntary gift to the daughter, nor was it an expression of concern for her future happiness. It was more like a yoke clamped on a woman or like a sale coupon tagged on the bridegroom to fetch more money in the matrimonial market." মনময়ী বসু এখানে বলতে চেয়েছেন যে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তার পরে পণপ্রথা একটা কুৎসিত আকার ধারণ করেছে; এর প্রধান কারণ হল ব্যবসা আর কালো টাকার অনুপ্রবেশ। পণ আর কন্যাকে দেওয়া স্বেচ্ছাকৃত উপহার রইল না। এটা যেন এখন বিক্রয়ের কুপনের মতো, যার দ্বারা বিয়ের বাজারে কনের দাম ঠিক করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *দেনা-পাওনা* ছোটো গল্পে পণপ্রথার এই সমস্যা বহু আগেই তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে তুলে ধরেছিলেন।

নারীবাদী আন্দোলনের তীব্রতা বা নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়া যতই তার পরাক্রম দেখাক না কেন, রাষ্ট্রীয় আইন তথা, Women Protection Laws, Section 498A, IPC 45 (1860), Dowry Prohibition Act 1961, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 প্রভৃতি যতই নারীর মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোক না কেন, সামাজিক পটভূমিতে এগুলি কতটা প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পেরেছে, তা বিতর্কাতীত নয়।

2007 সালে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় যে, একটি নারীর মৃত্যু হয়, "... every four hours over a dowry dispute, as per official data, despite a series of laws to empower them." (*Hindustan Times*, New Delhi, December 24, 2007)। National Crime Records Bureau-এর সমীক্ষা অনুযায়ী 2004 সালে 2,585 জন মহিলা, 2005 সালে 2,305 জন মহিলা, 2006 সালে 2,276 জন মহিলা পণ সংক্রান্ত বিবাদের দরুণ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ 30,942 (NCRB, 2012)-র NCRB প্রতিবেদন অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে মহিলাদের গৃহহিংসাজনিত কারণে আত্মহনন যথেষ্ট উদ্বেগজনক; পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে বিশেষত দুটি কারণে—

(১) গৃহাভ্যন্তরীণ সমস্যা পুলিশ প্রশাসনের নজরে নিয়ে আসায় মহিলাদের স্বভাবসিদ্ধ সংকোচ এবং (২) প্রশাসনেব পক্ষ থেকে মামলা নথিবদ্ধকরণে নিরাসক্তি। মহিলাদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা, সামাজিক মর্যাদা হানির আশঙ্কা প্রভৃতি মামলা নথিবদ্ধকরণের পথে প্রধান অন্তরায়।

মহিলাদের প্রতি নির্যাতন ও পারিবারিক নির্যাতন সম্পর্কিত ঘটনা সম্বন্ধে কিছু তথ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতি চার ঘণ্টায় পণের জন্য ভারতের একজন মহিলা আত্মহত্যার রাস্তা বেছে নেন। যদিও মহিলাদের অধিকার

সম্পর্কিত একগুচ্ছ আইনের প্রমাণ রয়েছে, ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো-র সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশে মহিলাদের পণপ্রথার ফলে আত্মহত্যার পরিমাণ সর্বোচ্চ। বিগত বছরে ওই রাজ্যে মোট ৫৯৭টি মামলা এই বিষয়ে নথিভুক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয় এবং এরপরেই রয়েছে উত্তরপ্রদেশের অবস্থান। এমনকি রাজধানী দিল্লি এক্ষেত্রে সপ্তম স্থানে রয়েছে ৭০টি মামলাসহ।

Indian Penal Code-এর Section 304B-তে 'Dowry Death' নিয়ে বলা হয়েছে। এই অপরাধটি 'cognizable, non-bailable, non-compoundable and to be tried in Courts of Session.' এই ধারায় সাত বছরের জেল, এমনকি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু "The death has to be immediately preceded by cruelty and harassment due to dowry and has to be a *abnormal circumstances* within seven years of marriage." এটা প্রমাণ করা কঠিন ব্যাপার এবং আইনের এই ফাঁকের আশ্রয় নিয়ে অপরাধীরা পার পেয়ে যায়।

"One of the main ingredients required to prove the fault of the accused is to establish that she was harassed "soon before her death" for dowry. Is this the main factor for the increase in crime and for rendering this law meaningless?"— বিক্রম শ্রীবাস্তব তাঁর *Dowry Death: India's Shame* শীর্ষক নিবন্ধে এই প্রশ্নটাই করেছেন (উৎস:countercurrents.org)।

ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের 498A ধারাটি 1980-এর দশকে প্রণীত হয় সমাজে পণ বিভীষিকাকে রোধ করার উদ্দেশ্যে। নারী উক্ত ধারার মাধ্যমে তার ওপর সংঘটিত পণের দরুন অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করতে পারে; 498A অনুযায়ী স্বামী এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে স্ত্রীর ওপর অত্যাচারের ঘটনাকে উপস্থাপিত করার জন্য রাজ্য একজন সরকারি উকিল নিযুক্ত করবে। কিন্তু জামিন গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় এই আইন অনুসারে সমস্ত অপরাধীদের (যেমন— বয়স্ক নাগরিক, স্বামীর মা এবং স্বামীর বোন) তদন্ত ছাড়াই গ্রেপ্তার করা হয় এবং শীঘ্রই 498A এবং অন্যান্য ধারাগুলির অপব্যবহার হতে শুরু করে। এই অপব্যবহার পরবর্তীকালে একটি 'standard malpractice'-এ পরিণত হয়। সুপ্রিম কোর্ট 2005 সালে সুশীল কুমার শর্মা বনাম ইউনিয়ন-এর ঘটনায় 498A-এর অপব্যবহারটিকে 'লিগাল টেরোরিজম' আখ্যা দিয়েছেন।

National Crime Research Bureau (2011)-র রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে প্রতি ঘন্টায় পণপ্রথার জন্য যেসকল মহিলার মৃত্যুর মামলা নথিভুক্তকরণ হয় সেখানে আত্মহত্যা ও হত্যা, দু'রকমের ঘটনাই রয়েছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই মহিলাটির শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা ঘটনাটিকে অনিচ্ছাকৃত বা দুর্ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। মহিলাদের প্রতি পরিবারিক হিংসা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে এশিয়ার দেশগুলিতে।

মনময়ী বসু তাঁর *Hindu Women and Marriage Law* শীর্ষক গ্রন্থের 'Dowry' নামক পঞ্চম অধ্যায়ে পণপ্রথা বিরোধী আইনের ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘ বিশ্লেষণ করেছেন। লোকসভায় এই বিলটি যখন উপস্থাপিত হয় তখন কোনো কোনো সাংসদ এটিকে স্বাগত জানান; আবার কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেন। নারায়ণ কুট্টি মেনন বিলটিকে সমর্থন করে বলেন শুধুমাত্র আইন দ্বারা কোনো সামাজিক ব্যাধি দূর করা যায় না ("... he had doubts about whether the pernicious system could be ended by mere legislation")। পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব বলেন পণপ্রথা একটি অশুভ ব্যবস্থা সন্দেহ নেই কিন্তু এর জন্য জামাতা বা তার পিতা-মাতাকে জেলে পাঠানো উচিত নয়। তিনি এই যুক্তি খাড়া করেন যে অনেক উচ্চবিত্ত পরিবার পণ দিয়ে থাকে বিদেশে জামাতাকে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেরণ করার স্বার্থে। বিলটি সমর্থন করেন সুবিমল ঘোষ, হেম বড়ুয়া, ইলা পালচৌধুরী, পার্বতী কৃষ্ণান, মঞ্জুলা দাস, রেণু চক্রবর্তী প্রমুখ সাংসদরা। বিলে পণ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়— অনেকে এর বিরোধিতা করেন। বিতর্কে অংশগ্রহণ করে তৎকালীন আইনমন্ত্রী শ্রী এ.কে. সেন বলেন যে শুধুমাত্র আইন দ্বারা সামাজিক কুপ্রথা দূর করা যায় না ("a social evil like dowry could not be fought or remedied only by legislation.")। তাছাড়া আর একটি দিক ভেবে দেখার মতো— হিন্দু সমাজে অনেক পিতাই কন্যাকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন; পণের মাধ্যমে কন্যা যদি সম্পত্তির কিছু অংশ পায় তাহলে তা নিন্দনীয় কিছু নয়; তবে তা একেবারেই বাধ্যতামূলক বা পীড়নমূলক হওয়া বাঞ্ছিত নয়। যাই হোক নানা কারণে মতবিরোধের জন্য বিলটি লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ করা হয় এবং ১৯৬১ সালের ২০ মে এটি রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লাভ করে। তখন থেকে এটি Dowry Prohibition Act 1961 (Act XXXVIII of 1961) রূপে বিবেচিত হয় ও ১৯৬১ সালের জুলাই মাস থেকে কার্যকরী হয়।

১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মেয়েদের যখন সম্পত্তির সমানাধিকার দেওয়া হয়েছিল, তখন মনে হয়েছিল যে এবার পণপ্রথা বন্ধ হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় ১৯৬১ সালে Dowry Prohibition Act বা পণপ্রথা নিরোধক আইনও পাশ হল। এই আইনের বলে পণ দেওয়া এবং নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। ১৯৬১ সালে শাস্তির মেয়াদ ছিল ন্যূনতম ছয় মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত এবং জরিমানা দশ হাজার টাকা বা পণের সমতুল্য। পণ দেবার অপরাধ ছিল জামিনযোগ্য এবং যেসব উপহার যেমন বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যা বিয়ের জন্য আবশ্যক তার মূল্য যদি ২০০০ টাকার উর্ধ্বে না হয় তবে তা আইনের আওতার বাইরে থাকবে। অতএব এ হেন শিথিল আইনকে সমাজ কোনো মূল্যই দেয়নি এবং সমাজের উন্নতির সাথে সাথে পণের দাবিও 'উন্নততর' হয়েছে।

সংবিধানে পঁচিশ বছরের মধ্যে সমাজের অগ্রগতি চিহ্নিত করতে তৈরি হয়েছিল Committee on the Status of Women in India। সারা ভারতব্যাপী তথ্য সংগ্রহের

উপর কমিটির প্রতিবেদনে দেখা গেল যে সম্পত্তির আইনি অধিকার পাওয়া সত্ত্বেও পণপ্রথার কোনো পরিবর্তন হয়নি। খুব উদ্বেগের সঙ্গে কমিটি লক্ষ করল যে শিক্ষিত যুব সমাজ পণের দাবি সম্বন্ধে উদাসীন এবং তারা খুব সচেতনভাবে পণপ্রথাকে সমর্থন করে। ১৯৭৫ সাল আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত হল। তখন থেকে নারীর সমস্যার সমাধান নিয়ে দেশে বিদেশে অনেক আলোচনা, অনেক পরিকল্পনা নেওয়া হল। সারা বিশ্বে নারীর সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষকে নারী দশকে বিস্তৃত করা হয়েছিল। এই দশকের মধ্যে অনেক আইনি পরিবর্তন হয়েছে। পণপ্রথা নিরোধক আইনের প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে।

১৯৮৩ সালে পণ জনিত অপরাধগুলি পণপ্রথা আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে 498A ধারার মাধ্যমে ভারতীয় দণ্ডবিধি সংশোধিত হল যার বলে বধূ নির্যাতনের ঘটনাকে জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হল এবং ফৌজদারি কার্যবিধির 198A ধারা সংশোধন করে পুলিশকে এই অপরাধের তদন্ত করবার দায়িত্ব দেওয়া হল। এছাড়া বিয়ের সাত বছরের মধ্যে যদি কোনো বধূর শ্বশুরবাড়িতে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তবে সেটা পণজনিত কারণে মৃত্যু বলে চিহ্নিত হবে। এক্ষেত্রে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনও সংশোধিত হয়ে 113A ও 113B ধারা দুটি যোগ হল যার ফলে 113A অনুযায়ী আদালতের সামনে যদি তথ্য পেশ করা হয় যে বিয়ের সাত বছরের মধ্যে কোনো বিবাহিত মহিলা আত্মহত্যা করেছে তার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের নির্যাতনের ফলে, তাহলে আদালত কিন্তু, অবশ্যই সব সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর ভিত্তি করে, অনুমান করবে যে বধূটির আত্মহত্যায় শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা প্ররোচনা দিয়েছিল। আবার 113B ধারা অনুযায়ী আদালতের সামনে যদি প্রমাণ করা যায় মৃত্যুর কিছু সময় আগে থেকে পণের দাবি জানানো হয়েছিল এবং সেই দাবি আদায়ের জন্য বধূর উপর তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা নির্যাতন করেছিল, তাহলে আদালত ধরে নেবে যে পণজনিত কারণে বধূটির মৃত্যু হয়েছে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির 304B ধারা অনুযায়ী তাদের অন্তত সাত বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে।

পণপ্রথা রোধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, সাক্ষ্য আইন এবং ফৌজদারি কার্যবিধির এই পরিবর্তনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের আইন অনুসারে আদালত কিন্তু প্রথমেই ধরে নেবে যে আসামী নির্দোষ এবং সরকার বা বাদীপক্ষের উপর মামলা প্রমাণ করার সম্পূর্ণ দায় বর্তাবে। কিন্তু গৃহস্থের ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে সংগঠিত অপরাধ ওইভাবে প্রমাণ করা অধিকাংশ সময়ে সম্ভব ছিল না। তাই অপরাধী প্রমাণের অভাবে খালাস হয়ে যেত। সাক্ষ্য আইনের এই ধারাগুলির ফলে অপরাধগুলি প্রমাণ করা অনেক সহজ হয়ে যায় বিশেষত বিয়ের সাত বছরের মধ্যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে— কারণ আদালত অনুমান করতে পারবে যে স্বামী বা তাঁর আত্মীয়রাই অপরাধী।

তবে শুধুমাত্র ১৯৬১ সালের এই আইনে মামলা প্রায় হয় না। পণজনিত কারণে মামলা রুজু করা হয় যখন থানায় বধূমৃত্যু, বধূনির্যাতনের বা অন্যায়ভাবে স্ত্রীধন ফেরত দিতে অস্বীকার করবার মামলা হয়। আবার স্ত্রীধন ফেরত দেবার মামলায় দেখা যায় যে কোন জিনিসগুলি মেয়েটির স্ত্রীধন আর কোনটি নয়— তাই নিয়ে মামলা অনেকদূর গড়ায়। অথচ ১৯৮৫ সালে তৈরি হয় Dowry Prohibition (Maintenance of lists of Presents to the Bride and Bridegroom) Rules। এই বিধির বলে বিয়ের সময় পাত্রপাত্রীকে যেসব উপহার দেওয়া হয় তার একটি তালিকা পণ নিরোধক অফিসার বা Dowry Prohibition Officer-এর কাছে জমা দিতে হয়। কিন্তু এত বছরেও এই বিধির বাস্তবায়ন হল না।

পণ নিরোধক আইনে Dowry Prohibition Officer এই সামাজিক ব্যাধি মোচনের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি জেলার Social Welfare Officer যার দায়িত্ব পণ নিয়ে বিয়ে হচ্ছে কিনা তা দেখা; কিংবা কেউ পণ দাবি করছে কিনা বা পণের দাবি বা তা আদায়ের সহযোগিতা করছে কিনা। কিন্তু এক ব্যক্তির উপর নানান দায়িত্ব, তাই পণ নিরোধক ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ তার পক্ষে নেওয়া বস্তুত অসম্ভব।

পণপ্রথা আইনত উচ্ছেদ করা হলেও বাস্তবিকপক্ষে পণপ্রথা আজও চলছে; তবে বিশ্বায়নের যুগে ধরনটা হয়তো পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতি বছর গড়ে ৪,০০০ মহিলা খুন হন পণ-সংক্রান্ত কারণে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে ভারতবর্ষে পণপ্রথার বাজার রমরমিয়ে চলছে। যেসব সম্প্রদায়ের মধ্যে পণপ্রথা নেই, যেমন মুসলিম সম্প্রদায়, তাঁদের সমাজের গভীরেও পণপ্রথার শিকড় প্রবেশ করেছে। এইসব ঘটনাবলি দেখে মনে হয় যে ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের সামাজিক আন্দোলন কোথায় যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর সমাজের অনেক অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু পণপ্রথার কুসংস্কার অধিকাংশ ভারতবাসীর মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না। এই সমস্যা আবার শিক্ষিত আর্থিক সচ্ছল মানুষের মধ্যে অনেক বেশি। তাই 1921 সালের ভারতীয় জনগণনায় প্রতি 1000 পুরুষে 955 জন নারী ছিল। 1991 জনগণনায় যা নেমে আসে 1000 পুরুষে 927 হারে। 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী প্রতি 1000 পুরুষে নারী রয়েছেন 940। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা হল 1000:947।

উল্লেখযোগ্য যে উপজাতিদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর হার 1000:973। কিন্তু যেসব প্রদেশে মাথাপিছু আয় সবথেকে বেশি— যেমন হরিয়ানায় এই হার 1000:865 এবং পাঞ্জাবে 1000:882। নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের মতে "India will its present population of one billion has to account for 25 million missing women."

এই '25 million missing women' কারা? এবং এরা কেনই বা হারিয়ে যায়?

কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের বিশিষ্ট আইনজীবী চান্দ্রেয়ী আলমের মতে এর মূল কারণ হল কন্যাভ্রূণ হত্যা— যদিও তা দণ্ডনীয় অপরাধ। অধ্যাপক রাম আহুজা (Ram Ahuja)

তাঁর *Social Problems in India* গ্রন্থে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন:

ক) ফৌজদারি নির্যাতন (Criminal Violence)— ধর্ষণ, অপহরণ, খুন ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

খ) গার্হস্থ্য নির্যাতন (Domestic Violence)— পণ-সংক্রান্ত মৃত্যু, স্ত্রীকে প্রহার, যৌন অত্যাচার ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

গ) সামাজিক নির্যাতন (Social Violence)— ইভটিজিং ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এগুলি নিবারণের জন্য বেশ কিছু সংস্কারমূলক আইন রচিত হয়েছে।

যৌন হেনস্থা সংক্রান্ত আইন (Laws Relating to Sexual Harassment)

'Sexual harassment' কথাটির নানা রকম বাংলা করা হয়, যথা, যৌন হেনস্থা, যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতন। আমরা একঘেয়েমি এড়ানোর জন্য সময় বিশেষে সব শব্দগুলিই প্রয়োজন মতো ব্যবহার করব।

সংজ্ঞা (Definition):

আক্রান্ত মহিলা বলতে যেকোনো কর্মক্ষেত্রে কর্মরত যেকোনো মহিলাকে বলা হয়েছে। যৌন নিগ্রহ বলতে যে বিষয়গুলিকে বোঝানো হয়েছে তা হল— ১. শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা, ২. যৌন চাহিদা মেটানোর দাবি বা অনুরোধ, ৩. যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ৪. পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন, ৫. শারীরিক বা মৌখিক বা ইঙ্গিতবাহী, যৌনতাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ।

কর্মক্ষেত্র বলতে সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অর্থ সাহায্যে পরিচালিত বা প্রতিষ্ঠিত বা নিয়ন্ত্রিত বা সরকারি বিভাগ, সংগঠন উদ্যোগ ক্ষেত্র, প্রতিষ্ঠান, দপ্তর প্রভৃতি অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি কোম্পানি বা কর্পোরেশন বা সমবায় সমাজকে বোঝানো হয়েছে। যেকোনো বেসরকারি সংগঠন, উদ্যোগ ক্ষেত্র, অসরকারি সংগঠন (NGO), প্রমোদ ক্ষেত্র, বৃত্তিক্ষেত্র, শিক্ষাঙ্গন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্র ইত্যাদি বা হাসপাতাল ও নার্সিংহোম প্রভৃতিও এর এক্তিয়ারভুক্ত। নিয়োগের সময়ে বায়ু, স্থল, রেল বা সমুদ্রপথে কর্মীর গমন ক্ষেত্রে, যেকোনো অসংগঠিত ক্ষেত্রে কোনো রকম যৌন আচরণ এই নির্দেশিকার প্রতিরোধ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

বিশাখা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত সংজ্ঞা:

Sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behavior (whether directly or by implication) as:

1. physical contact and advances;
2. a demand or request for sexual favors;
3. sexually colored remarks;
4. showing pornography;
5. any other unwelcome physical verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

Where any of these acts is committed in circumstances where the victim has a reasonable apprehension that in relation to the victim's employment or work whether she is drawing salary, or honorarium or voluntary, whether in government, public or private enterprise such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem.

It is discriminatory for instance when the woman has reasonable grounds to believe that her objection would disadvantage her in connection with her employment or work including recruiting or promotion or when it creates a hostile work environment.

Adverse consequences might be visited if the victim does not consent to the conduct in question or raises any objection thereto.

Thus, sexual harassment need not involve physical contact. Any act that creates a hostile work environment—be it by virtue of cracking lewd jokes, verbal abuse, circulating lewd rumours etc. counts as sexual harassment.

কোর্ট অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে এবং সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই নির্দেশিকাগুলিকে বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করে। সুপ্রিম কোর্ট 'গাইডলাইনস ইন বিশাখা কেস' জারি করে সমস্ত রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্থা প্রমুখকে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ জারি করে। ১৯৯৭ সালে প্রদত্ত এই নির্দেশিকার ভিত্তি হল বিশাখা বনাম রাজস্থান রাজ্য এবং অন্যান্য মামলায় প্রদত্ত রায়। সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে যে লিঙ্গ সাম্যের অধিকারটি যেহেতু মৌলিক সেহেতু ১৪, ১৫ ও ২১ ধারা এবং ১৯(১)(ছ) ধারার মর্যাদা রক্ষা করতে হলে লিঙ্গ সাম্য বজায় রাখা এবং সেই উপলক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি; মহিলাদের প্রতি অমর্যাদাকর যৌন নির্যাতন প্রকৃতপক্ষে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষতান্ত্রিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অনবদ্য প্রয়াস। অতঃপর সমস্ত ছাত্র, অংশকালীন বা পূর্ণ সময়ের অধ্যাপিতা, শিক্ষিকা বা ছাত্রী, সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে সংগঠিত বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী, যেকোনো সাধারণ বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত মহিলাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

হবে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নির্দেশিকায় উল্লিখিত সংগঠনে 'Cell Against Sexual Harassment' গড়ে তুলতে হবে। এই Cell-এ অবশ্য এক বা একাধিক মহিলাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসহ সদস্য হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। প্রত্যেক রাজ্যের পুলিশ অধিকর্তা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক অপরাধীর শাস্তির জন্য আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং অভিযোগকারিণীর মৌখিক বিবরণের ভিত্তিতে লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। যেকোনো ধরনের শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা, বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্য বিনিময়, ধর্ষণ বা অন্য যেকোনো অমর্যাদাকর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলার কর্মস্থল, রাজ্যের সরকার ও পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।

1992 সালে রাজস্থানে বনোয়ারী দেবী, যিনি শিশু বিবাহ রোধের জন্য কাজ করতে গিয়ে গুর্জর পরিবারের পাঁচজন পুরুষের হাতে ধর্ষিতা হন, তাঁর ভয়াবহতার কথা মাথায় রেখে ১৩ অগাস্ট, ১৯৯৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট 'বিশাখা নির্দেশিকা' জারি করেন। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলে যে, "each incidence of sexual harassment of women at workplace results in violation of fundamental rights", 'gender equality' and 'the right to life and liberty' (JT 1997(7) SC 384)। এই রায়ে যেমন নিয়োগকর্তার দায়িত্ব, যৌন নিগ্রহের সংজ্ঞা, প্রতিকার, অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়, তেমনি ঘটনার প্রেক্ষিতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধিসমূহের প্রয়োগের নির্দেশও দেওয়া হয়, যথা— IPC Section 294, Section 344, Section 509 ইত্যাদি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এই অবস্থা রোধের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে সুপ্রিম কোর্টের বিশাখা নির্দেশটি নীচে দেওয়া হল:

Vishakha Guidelines

The Vishakha Guidelines were a set of procedural guidelines for use in India in cases of sexual harassment. They were promulgated by the Indian Supreme Court in 1997 and were superseded in 2013 by the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Background

Before 1997, a person facing sexual harassment at workplace had to lodge a complaint under Section 354 of the Indian Penal Code 1860 that

deals with the 'criminal assault of women to outrage women's modesty', and Section 509 that punishes an individual/individuals for using a 'word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman'.[1]

During the 1990s, Rajasthan state government employee Bhanwari Devi who tried to prevent child marriage as part of her duties as a worker of the Women Development Programme was raped by the landlords of the gujjar community. The feudal patriarchs who were enraged by her (in their words: "a lowly woman from a poor and potter community") 'guts' decided to teach her a lesson and raped her repeatedly.[2] The rape survivor did not get justice from Rajasthan High Court and the rapists were allowed to go free. This enraged a women's rights group called Vishaka that filed a public interest litigation in the Supreme Court of India.[1]

This case brought to the attention of the Supreme Court of India, "the absence of domestic law occupying the field, to formulate effective measures to check the evil of sexual harassment of working women at all workplaces."

Vishakha vs. State of Rajasthan

In 1997, the Supreme Court passed a landmark judgement in the same Vishakha case laying down guidelines to be followed by establishments in dealing with complaints about sexual harassment. **Vishakha Guidelines** were stipulated by the Supreme Court of India, in *Vishakha and others v State of Rajasthan* case in 1997, regarding sexual harassment at workplace. The court stated that these guidelines were to be implemented until legislation is passed to deal with the issue.[1]

From guidelines to act

The Sexual Harassment at workplace Bill was passed by the Lok Sabha on 2 September 2012. It is now The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. It defines sexual harassment as laid down by the Supreme Court in the *Vishakha and others v State of Rajasthan* (1997) case.

Internal Complaints Committee and Local Complaints Committee: The Sexual Harassment Act requires an employer to set up an Internal Complaints Committee (ICC) at each office or branch having more than

10 employees of any gender. The government is in turn required to set up a Local Complaints Committees (LCC) at the district level to investigate complaints regarding sexual harassment from establishments where the ICC has not been constituted on account of the establishment having less than 10 employees or if the complaint is against the employer.

The Sexual Harassment Act, 2013 also sets out the constitution of the committees, process to be followed for making a complaint and inquiring into the complaint in a time bound manner.

Interim Reliefs: The Sexual Harassment Act empowers the ICC and the LCC to recommend to the employer, at the request of the aggrieved employee, interim measures such as (i) transfer of the aggrieved woman or the respondent to any other workplace; or (ii) granting leave to the aggrieved woman up to a period of three months in addition to her regular statutory/ contractual leave entitlement.

In addition to ensuring compliance with the other provisions stipulated, the Sexual Harassment Act casts certain obligations upon the employer to, inter-alia,

- provide a safe working environment
- display conspicuously at the workplace, the penal consequences of indulging in acts that may constitute sexual harassment and the composition of the Internal Complaints Committee
- organise workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitizing employees on the issues and implications of workplace sexual harassment and organizing orientation programmes for members of the Internal Complaints Committee
- treat sexual harassment as a misconduct under the service rules and initiate action for misconduct
- The employer is also required to monitor the timely submission of reports by the ICC.

If an employer fails tp constitute an Internal Complaints Committee or does not comply with any provisions contained therein, the Sexual Harassment At prescribes a monetary penalty of up to INR 50,000 (approx. US$ 1,000). A repetition of the same offence could result in the punishment being doubled and/or de-registration of the entity or revocation of any statutory business licenses.[৪]

Preventive steps

- Sexual harassment should be affirmatively discussed at workers' meetings, employer-employee meetings, etc.
- Guidelines should be prominently displayed to create awareness about the rights of female employees.
- The employer should assist persons affected in cases of sexual harassment by outsiders.
- Central and state governments must adopt measures, including legislation, to ensure that private employers also observe the guidelines.
- Names and contact numbers of members of the complaints committee must be prominently displayed.

এই নির্দেশিকার পরিপ্রেক্ষিতে নারী এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা তিরাত 26/11/2010-এ একটি বিল পাশ করেন। এই বিলটির নাম হল 'The Protection of Women Against Sexual Harassment At Work Place Bill, 2010'। বিলটির উদ্দেশ্য হল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন নিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা এবং যৌন নিগ্রহের প্রতিরোধ ও প্রতিকার। এই বিলটিতে উল্লেখ করা হয় যে, নারীর এই ধরনের নির্যাতন তাঁর 14 এবং 15 ধারায় বর্ণিত সাম্যের অধিকারের পরিপন্থী এবং 21 ধারায় বর্ণিত 'জীবন ও মর্যাদাপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা'র তাগিদের পরিপন্থী; আরও উল্লেখিত হয় যে এই ধরনের নির্যাতন যেকোনো বৃত্তি, পেশা এবং একটি নিরাপদ পরিবেশে কর্ম সম্পাদনের অধিকার প্রাপ্তির বিরুদ্ধাচরণ করে। 2010-এর এই 144 নং এই বিলটি 1993-এর 25 জুন উত্থাপিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সাপেক্ষে রচিত Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women-কে আরও শক্তিশালী করে।

উপরিউক্ত বিলটিতে 'Internal Complaint Committee' গঠনের কথা বলা হয়েছে, যা প্রত্যেক নিয়োগকর্তার জন্য বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি মহিলা হবেন এবং অন্যান্য সদস্যদের অন্তত দুজন মহিলাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সংবেদনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত হবেন। সভাপতি হিসেবে বরিষ্ঠ মহিলা অধিকর্তা পাওয়া না গেলে মনোনয়নের মাধ্যমে ওই পদ পূরণ করা যাবে অথবা 'Local complaints committee' থেকেও জেলা অধিকর্তা তাকে মনোনীত করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, ম্যাজিস্ট্রেট বা রাজস্ব সংগ্রাহক বা সহকারী সংগ্রাহক জেলা অধিকর্তা হিসেবে কাজ করবেন।

মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হিংসা সংক্রান্ত আইন (Laws relating to violence against women)

নারী উৎপীড়ন হল সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে নিষ্ঠুর একটি দিক, যার দ্বারা মহিলারা পুরুষের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়। এটি অসম ক্ষমতা সম্পর্কের এক বহিঃপ্রকাশ বটে, যা সমাজে নারীদের ওপর পুরুষের প্রাধান্য কায়েম করে, নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে এবং যা অপরদিকে সামাজিক অসমতার একটি কারণ।

বিশাখা নির্দেশিকা— মূল বৈশিষ্ট্য

১৯৯৭ সালের ১৩ অগাস্ট বিশাখা বনাম রাজস্থান সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্মস্থলে মহিলাকর্মীদের নানা ধরনের যৌন হেনস্থার বিষয়টিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন এবং তা প্রতিরোধকল্পে বাধ্যতামূলকভাবে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থাগুলিকে দিয়েছেন। এগুলি হল:

- কর্মস্থলে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে এবং মহিলাকর্মীদের যেন বিদ্বেষমূলক পরিবেশে কাজ না করতে হয়;
- যৌন হেনস্থার অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য প্রত্যেকটি সংস্থায় একটি করে কমিটি গঠন করতে হবে, যার মোট সদস্যের অর্ধেক হবেন মহিলা। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিও এই কমিটির সদস্য হবেন;
- অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে ফৌজদারি সাজা দেওয়া যাবে;
- অভিযোগকারী বা সাক্ষীদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া ও হেনস্থা থেকে মুক্ত রাখার বন্দোবস্ত সুনিশ্চিত করতে হবে;
- অভিযোগকারী মহিলাকর্মী তার পছন্দমতো অন্যত্র বদলি অথবা দোষী ব্যক্তির বদলি দাবির অধিকার থাকবে।

এই নির্দেশিকাকে প্রচারে আনা ও জনমত সংগঠিত করার উপর সুপ্রিম কোর্ট সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

তথ্যসূত্র: সুপ্রিম কোর্টের রায়

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *সাম্য* প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "দেশে অনেক অ্যাসোসিয়েশন, লিগ, সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে— কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু

স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে যেন প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রীজাতি— তাহাদের উপকারার্থ কেহ নাই . . .।"

আর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "The scriptures forbid the sacrifice of female animals, but in the case of human beings sacrificing females gives the greatest satisfaction." (Quoted by Sudhir Chandra in *Enslaved Daughters*)।

এদেশে কন্যাভ্রূণ হত্যা এখনও প্রচলিত। National Crime Records Bureau (NCRB)-এর ২০১১ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী নারী নিগ্রহ ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু বিবাহের ঘটনা আজও ঘটে চলেছে।

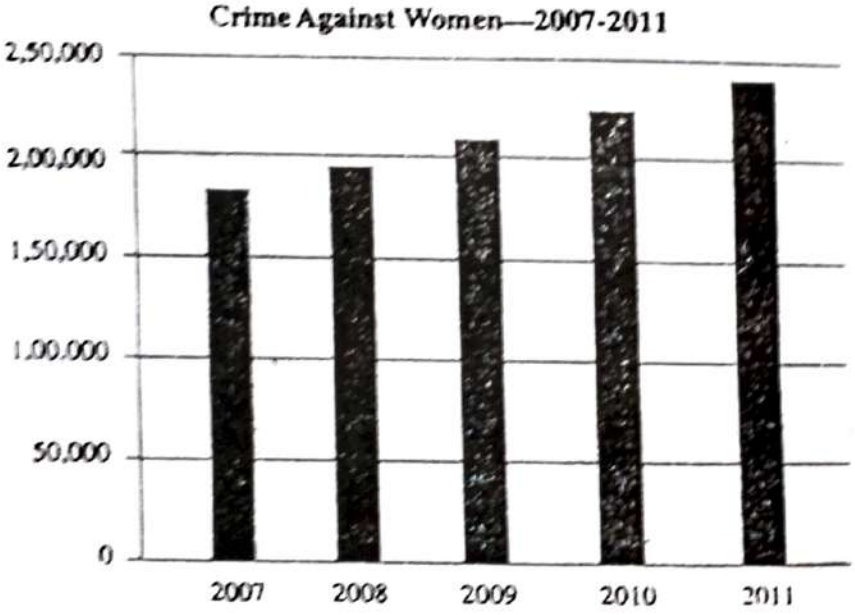

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতানুযায়ী, নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত উৎপীড়ন লিঙ্গভিত্তিক উৎপীড়নের যেকোনো কার্যাবলিকে উল্লেখ করে, যা মূলত নারীদের ওপরে সংঘটিত শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক অত্যাচারকে বোঝায় এবং যা মূলত নারীদের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করে। যেকোনো ক্ষেত্রেই যেমন ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত জীবনে এই ঘটনা ঘটতে পারে; অন্যভাবে বলা যায় যে, নারীদের ওপর সংঘটিত উৎপীড়ন হল শারীরিক, যৌন এবং মনস্তাত্ত্বিক উৎপীড়ন, যা পরিবারের মধ্যে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটতে পারে এবং যা অন্তর্ভুক্ত করে মহিলা ও শিশুর ওপর সংঘটিত যৌন উৎপীড়ন, তাদের নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দরকষাকষি, বিভিন্ন কারণে তাদের ওপর অত্যাচার, যা কিনা মহিলাদের মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত।

নারীর ওপর উৎপীড়নকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং যৌন উৎপীড়ন, যা মূলত সংঘটিত হয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, যেমন কার্যক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্যত্র ধর্ষণ, যৌন হয়রানি প্রভৃতি।

(খ) শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং যৌন উৎপীড়ন, যা মূলত পরিবারের মধ্যে ঘটে থাকে, যেমন, পণ সংক্রান্ত উৎপীড়ন, নারীদের ওপর বলপ্রয়োগ, পরিবারের মধ্যে মহিলা ও শিশুর ওপর যৌন হয়রানি, যা গৃহাভ্যন্তরে দুষ্ট ব্যাধির মতো ক্রমবর্ধমান। মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হল গার্হস্থ্য উৎপীড়ন; গার্হস্থ্য উৎপীড়ন বলতে বোঝায়, স্বামী অথবা অন্যান্য নিকট সহযোগীদের দ্বারা নারীদের উৎপীড়ন এবং অপব্যবহার। এটি পারিবারিক উৎপীড়নের পুরোপুরি সমগোত্রীয় নয়, যা মূলত বোঝায় পরিবারের মধ্যে সংঘটিত সকল প্রকারের উৎপীড়নকে। যদিও ৯০-এর দশকে বহু নীতি প্রণয়নকারী আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ নারী উৎপীড়নকে পৃথক সত্তায় চিহ্নিত করেন, নারী উৎপীড়ন বলতে মূলত গার্হস্থ্য উৎপীড়নকেই অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। গার্হস্থ্য উৎপীড়নের অভিজ্ঞতা এবং সহ্যক্ষমতা উভয়ই সমাজে নারীদের ক্ষমতার অন্যতম বাধা, যা মূলত নারীদের স্বাস্থ্য, আচরণ এবং মানসিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে। গার্হস্থ্য উৎপীড়ন হল, 'Domestic abuse, spousal abuse, battering, family violence, dating abuse, intimate partner violence'। দেখা গেছে যে, প্রায় প্রতিটি দেশেই ১৬-৬২ বছরের মহিলারা তাদের নিকটতম সহযোগীদের হাতে নির্যাতিতা।

পণের দরুন নারীর মৃত্যুকে, বা বলা যায়, হত্যাকে প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন প্রকারের আইনগত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, এই প্রসঙ্গে ১৯৮৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর প্রণীত The Criminal Amendment Act, 1983 উল্লেখ্য। এই আইন অনুযায়ী অপরাধী স্বামীর জরিমানাসহ ৩ বছরের হাজতবাস হতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামী ছাড়াও অত্যাচারিত মহিলার নিকট আত্মীয় যার দ্বারা তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন, তারও শাস্তি প্রাপ্য হতে পারে। কোনো মহিলাকে আত্মহত্যার দিকে প্ররোচিত করে, তার জীবনে বিপদ ডেকে এনে অথবা তার ওপর আঘাত করে বা অন্য অর্থে নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হয়, বা অন্যের চাহিদা পূরণ কোনো একটি মহিলার ওপর অত্যাচারের কারণ হয়ে ওঠে, তা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইনের মধ্যে ১৯৬১ সালে প্রণীত Dowry Prohibition Act, 1961, The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, The Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1979, Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, Domestic Violene Act, 2005 উল্লেখযোগ্য। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান কল্পে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি হল—

- Dowry Death, 1986 সংক্রান্ত আইনে 30B ধারা সংযোজন,
- বিশ্বাসঘাতকতার জন্য উল্লেখ্য ধারা [IPC 406], যার দরুন জেল জরিমানা হতে পারে,

- Sec. 304-B IPC
- ১৯৮৩ সালে প্রণীত ধারা (সম্প্রতি উক্ত ধারার একটি সংশোধন হয়),
- ২০০৬-এ পণ বিরোধী আইনের অধীনে দ্বিতীয় স্ত্রীর মর্যাদা,
- ২০১৭-এর পণ বিরোধী আইন প্রভৃতি।

পণ সংক্রান্ত আইনগুলির যাতে অপব্যবহার না হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করেন।

উক্ত বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও নারীদের বলি হওয়াকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা যায়নি, যা বিভিন্ন সংবাদপত্রে বা দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রায়শই প্রকাশিত হয়। ২০১১ সালে প্রকাশিত NCRB-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত উৎপীড়নের সংখ্যা নিম্নরূপ:

সমগ্র ভারত:	2,28,650
পশ্চিমবঙ্গ:	29,133
(সর্বাধিক) মধ্যপ্রদেশ:	36,500

এর মধ্যে পণজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা 4,391 (নথিবদ্ধ), যা পূর্বের থেকে 2.7 শতাংশ বেশি। এক্ষেত্রে সর্বাধিকার প্রাপ্য উত্তরপ্রদেশের (2,322); এছাড়া 498A ধারায় নথিবদ্ধ অপরাধের সংখ্যা 94,041, যা পূর্বের থেকে 5.4 শতাংশ অধিক।

মহিলাদের প্রতি বিবিধপ্রকার অত্যাচারের প্রকোপ সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত ঘোষণাপত্রে (Elimination of Violence Against Women) 'মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা'— বলতে কী বোঝায়, সেই সম্পর্কে একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে— বলা হয়েছে যে, পরিবার বা পরিবারের বাইরে যেকোনো প্রকার দৈহিক, মানসিক, যৌন অত্যাচার, যা মহিলাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে, সেই সকল ঘটনা মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বলে চিহ্নিত হবে। মহিলাদের প্রতি এই ধরনের অত্যাচার তাদের পারিবারিক ক্ষেত্রে, কর্মস্থলে, সম্প্রদায়গতভাবে, এমনকি জেলের অভ্যন্তরেও ঘটে থাকে। প্রায় প্রতিটি দেশেই বর্তমানে মহিলাদের প্রতি পারিবারিক হিংসার বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও আলোচনা সংঘটিত হচ্ছে। এই ধরনের গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, সারা পৃথিবী জুড়েই প্রায় ২০-৫৫ শতাংশ মহিলা পারিবারিক হিংসার বলি হন।

ভারতে পারিবারিক হিংসা একটি অসুস্থ, সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এর কারণ হিসেবে কতকগুলি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়, যেমন, স্বামীর মদ ও অন্যান্য নেশা সংক্রান্ত সমস্যা হল প্রধান। এছাড়া দারিদ্র, পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়া, পণের জন্য দাবি এবং স্বামীর

একাধিক নারীসঙ্গ ইত্যাদি হল আনুষঙ্গিক সমস্যা। তবে এইসব সমস্যাগুলি মূলত একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত, যেখানে মহিলাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানের প্রশ্নটিই হল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে, পুরুষ-নারীর মধ্যে যে বৃহত্তর বৈষম্য রয়েছে তার ফলে মহিলাদের প্রতি পারিবারিক হিংসার প্রকোপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে আশার কথা এই যে, সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবী জুড়েই পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ গড়ে উঠছে। ভারতও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। 2005 সালে Protection of Women from Domestic Violence Act পাশ হয়। এতদিন পর্যন্ত চার দেওয়ালের মধ্যে যে হিংসা, নির্যাতনের ঘটনা ঘটত, এই আইনের মারফত তার সামাজিক প্রতিকারের সুযোগ হয়েছে। অন্যান্য আইনের থেকে এই আইনের অনেক পার্থক্য। আইনে Protection Officer, Shelter Homes এবং Service Provider-এর ব্যবস্থা অর্থাৎ বিপদের সময় আশ্রয় পাবার কিংবা হিংসার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করবারও ব্যবস্থা আছে। ধরা যাক যেকোনো মহিলা গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ করল। অভিযোগ জানানোর পরে ম্যাজিস্ট্রেট Protection Officer-এর রিপোর্ট চাইতে পারে— আদেশ দিতে পারে বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে counselling দরকার, কিংবা welfare expert-এর পরামর্শ, ডাক্তারের সাহায্য দরকার। কিংবা মেয়েটিকে shelter হোমে আশ্রয় দেওয়া প্রয়োজন। এই আইনটিতে প্রথমেই গ্রেফতার ইত্যাদির সম্ভাবনা নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া আদেশ যদি বিবাদী অমান্য করে তাহলে একবছর পর্যন্ত কারাবাস (যা সশ্রমও হতে পারে) বা কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা কারাবাস এবং জরিমানার আদেশ দিতে পারবে।

এই আইন অনুযায়ী গার্হস্থ্য হিংসায় বিভিন্ন রকমের আঘাতের উল্লেখ আছে। এই আঘাতগুলি দৈহিক, যৌন, মৌখিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক। যদি পণ আদায়ের জন্য কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে উত্ত্যক্ত বা ক্ষতি বা আহত বা বিপন্ন করে কিংবা কোনোভাবে শারীরিক বা মানসিক ভাবে ক্ষতিসাধন করে তাহলে ওই সব আচরণ গার্হস্থ্য হিংসা বলে চিহ্নিত হবে।

বিপন্ন মানুষের যাতে আইনি সাহায্য পেতে কোনো অসুবিধা না হয়, তাই পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট এবং Service Provider-দের উপর সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে বিপন্ন মহিলা বা শিশুকে তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। তার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে হবে। তার সাহায্যের প্রয়োজনীয় উপায় জানাতে হবে, সরকারি আইনি সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে ভারতীয় দণ্ডবিধির 498A ধারায় অভিযোগ দায়ের করবার অধিকার জানাতে হবে।

উত্তরাধিকার আইনের আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছিল যে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আইনের দরুন কোনো ব্যক্তি যদি তার বাবা বা মায়ের আগে মারা যায় তাহলে সেই মৃত ব্যক্তির পরিবারের কিন্তু উত্তরাধিকারের কোনো অধিকার থাকে না। অতএব ওই পরিস্থিতিতে বাড়ির বউ বা মেয়ে হয়ে ওঠে চক্ষুশূল কেননা তাদের কোনো অধিকারও নেই। এই আইনের বলে যে পরিবারের মধ্যে মহিলা বাস করত, সেখানে তার আইনি অধিকার না থাকলেও তাকে তার বাসস্থান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

ম্যাজিস্ট্রেটের যদি অভিযোগ শুনে মনে হয় যে অভিযোগকারী গার্হস্থ্য হিংসার শিকার কিংবা শিকার হবার সম্ভাবনা আছে তাহলে বিবাদীকে কোনো হিংসাত্মক আচরণ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেবে; চাকুরিস্থলে কিংবা স্কুলে বা অন্যান্য স্থানে যেতে বারণ করবে, কোনো সংস্রব রাখতে বা সম্পত্তি হস্তান্তর, বা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট বা লকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া ব্যবহার করতে বারণ করবে। বাড়িতে থাকার ব্যাপারে এই আইনে আদেশ দেওয়ার সুযোগ আছে। এমনকি বিবাদী বা তার আত্মীয়দের বাড়িতে ঢুকতে, বাড়ি কোনোভাবে ছেড়ে দেবার উদ্যোগ নিতে বিরত থাকার আদেশ দিতে পারে। বিবাদী যদি কোনো ব্যবস্থা নিতে চায় তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে নিতে হবে। আবার ম্যাজিস্ট্রেট বিবাদীকে আদেশ দিতে পারবে যে অভিযোগকারীকে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করতে হবে— যা অবশ্যই সে যেরকম অবস্থায় থাকত তার অনুরূপ এবং প্রয়োজনে নতুন বাসস্থানের ভাড়া দিয়ে যেতে হবে। এইসব ছাড়াও ম্যাজিস্ট্রেট অর্থ দেবার আদেশ দিতে পারবে যদি অভিযোগকারীর আয়ের ক্ষতি হয়। চিকিৎসার খরচ, সম্পত্তির বিনষ্টের ক্ষতিপূরণ বাবদ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির 125 ধারা অনুযায়ী ভরণ-পোষণের আদেশ দিতে হবে।

পরিবারের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য, কুসংস্কার, অভাব অনটন, হিংসা থেকে কিন্তু পাচারের ঘটনা ঘটে। লিঙ্গ বয়স নির্বিশেষে পাচার হতে পারে। তারপর আছে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস— কর্ণাটকের দেবদাসী, অন্ধ্রপ্রদেশে, তামিলনাড়ুতে বাসবী যোগিনী প্রথা। নর্তকী হিসাবে বা মন্দিরের কাজে মেয়েদের উৎসর্গ করা বিভিন্ন রাজ্যেই হয়। এছাড়া বিপন্ন পারিবারিক জীবন। তিন তালাকের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সম্বন্ধে *ফজলস বিবি বনাম কাদের আলি* মামলায় সুপ্রিম কোর্টের মর্মস্পর্শী আদেশ থেকে ফুটে ওঠে যে মেয়েরা কীভাবে পাচার হয়ে যায়। রায়টি যদিও ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত কিন্তু এই আলোচনার পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক:

> The point must be clearly understood that the scheme of the complex provisions of chapter IX has a social purpose. Ill used wives and desparate divorces shall not be driven to material and moral dereliction to seek sancturary in the streets.

'Ill used wives and desparate divorces'-এর একটা বড়ো অংশের ঠাঁই পতিতালয়। মেয়েদের এই কারণে পাচার রুখবার উদ্দেশ্যে বর্তমান আইন The Immoral

Traffice (Prevention) Act আইনটিতে পতিতালয় চালানো, পতিতালয়ে কোনো নাবালিকাকে পাওয়া গেলে কিংবা ডাক্তারি পরীক্ষার পর যদি তার উপর কোনো যৌন নিগ্রহের চিহ্ন থাকে কিংবা কোনো মহিলাকে পতিতালয়ে আটকে রাখতে তার পরিধেয় বস্ত্র, অলঙ্কার বা অর্থ বা মহিলার নিজস্ব কোনো সম্পত্তি আটকে রাখে, কিংবা তাকে আইনি ব্যবস্থার হুমকি দেয় তাহলে ওইসব আচরণগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ যার শাস্তি অন্তত ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড (যা সশ্রমও হতে পারে) বা দশ বছর কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। এছাড়া আদালত জরিমানাও করতে পারে। আবার পতিতাবৃত্তির রোজগারের উপর ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে কোনো ব্যক্তি যদি আর্থিক নির্ভরশীল হয় তাহলেও দুই বছরের শাস্তি ও জরিমানা হতে পারে। পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে কোনো মেয়েকে জোগাড় করা, খরিদ করা সবই দণ্ডনীয় অপরাধ।

সম্প্রতি তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা বন্ধ করতে মোদি সরকার The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2017 লোকসভায় পাশ করে কিন্তু রাজ্যসভায় তা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এই আইনে SMS, WhatsApp, e-mail বা বাক্যের দ্বারা তিন তালাক প্রথা রদ করা হয়েছে। উল্লেখ্য সুপ্রিম কোর্টও তিন তালাক প্রথার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। ২২ অগাস্ট ২০১৭ সালে একটি যুগান্তকারী রায়ে সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাক প্রথাকে "manifestly arbitrary, illegal and void" বলে আখ্যায়িত করেছে। এরপর রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance 2019 জারি করে তিন তালাক প্রথা বন্ধ করেছেন। বলা হয়েছে, "The ordinance makes the practice of instant triple talaq a penal offence for Muslim men" (*India Today*, 21 February, 2019)।

তথ্যসূত্র:

১। Ahuja, Ram, *Social Problems in India.*

২। Chandra, Sudhir, *Enslaved Daughter.*

৩। Das, P.K., *Handbook on Protection of Women from Domestic Violence Act and Rules.*

৪। Singh, Harsharan, *Women's Security and Indian Law.*

৫। *Oxford Handbook of Law, Women and Employment in India.*

৬। *Women and Law in India* (An Oxford Omnibus).